

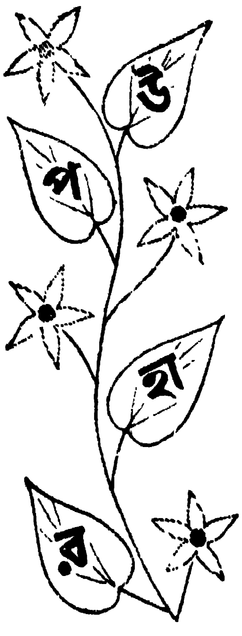
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

জুন
১৯৬১

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯


উ
প
হ
র

এক

ঢং, ঢং, ঢং, ঢং—

ভোর চারিটার ঘড়ি পেটা শেষ হইয়া গেল। ওদিকে কোন একটা টাওয়ার ক্লকে শেষ দুইটা ঘণ্টা এখনও বাজিতেছে। চারি দিক্‌প্রান্তের অন্ধকার নিষ্প্রভ ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। সমস্ত ধরণী একটা তন্দ্রাতুর নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। শুধু একটা সন্‌সন্‌ শব্দ অবিশ্রাম স্রোতের মত বহিয়া চলিয়াছে—যেন ওই নিস্তব্ধ অন্ধকারের মাঝে কে মৃদু গুঞ্জনে বিলাপ করিতেছে।

হয়তো বা মা ধরণী,—

মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের লজ্জায়, বেদনায়, জীবধাত্রী বুঝি নিস্তব্ধ অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া লইতেছেন!

ঝাপসা অন্ধকার আর ওই সকরুণ সুর-শব্দের আচ্ছন্নতার মধ্যে বিশাল প্রাচীর বেষ্টনীতে ঘেরা বন্দিশালা যেন একটা রহস্যপুরীর মত দাঁড়াইয়া আছে।

চারিদিকে পাষাণ-বেষ্টনী। সম্মুখে লোহার গরাদে ঘেরা বিশাল লৌহদ্বার মোটা লোহার শিকলের পাকে পাকে বাঁধা। লৌহদ্বারের সম্মুখে উদ্যতাস্ত্র জাগ্রত প্রহরী! তন্দ্রাতুর এলায়িত-তনু বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যেও শক্তিমানের শাসন সমান দৃঢ়, সমান রুক্ষ, সমান সজাগ রহিয়াছে। সে যেন শিথিল হইবার নয়।

বন্দিশালার ভিতরের রূপ তখন আরও ভয়াল!

চারি দিক্‌প্রান্তের স্বচ্ছতার মাঝে বন্দিশালার বুকে বুকে তখনও জমাট অন্ধকার জাগিয়া আছে। প্রভাতের অগ্রগামী ক্ষীণ প্রসন্নতা যেন ওই বিশাল প্রাচীর-বেষ্টনী লঙ্ঘন করিয়া আসিতে সাহস করে না।

ওই অন্ধকারের মধ্যে আলো ফেলিয়া সান্ত্রীর দল এধার হইতে ওধার পর্যন্ত পাহারা দিয়া চলিয়াছে।

'চার ঘন্টি' বাজিতেই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কয়েদীর দল উঠিয়া জাগিয়া বসিল। এইবার দ্বার খুলিবে, বাহির হইবার হুকুম আসিবে।

ভোরের একটা রহস্যভরা ঘুমঘোর প্রতি মুহূর্তেই তাহাদের অবসন্ন চোখের পাতায় পাতায় চাপিয়া বসে, সকলেই যেন ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতে চায়।

ঘরের বাহিরের বাঁধান ফালি রাস্তাটায় শিথিল অবসন্ন পদের নাল-মারা বুটের আওয়াজ বাজিয়া গেল—খট্‌ আবার খট্‌। প্রহরীর পা-ও যেন আর চলে না! ওদিকে গুমটি হইতে হাঁক আসিল—'আ—হো—চার-নম্বর!'

নালমারা বুটের শব্দ ত্রস্ত ভাবে উচ্চতর হইয়া উঠিল; সিপাহী খাড়া হইয়া তালে তালে পা ফেলিয়া চলিল—খট্‌—খট্‌—খট্‌—খট্‌—

চার নম্বর ওয়ার্ডের ভিতরে কয়েদী, প্রহরী, মেট বিচিত্র সুরে গান করিয়া গণনা শুরু করিয়া দিল—এক, দুই, তিন, চার,—

তন্দ্রাতুর বন্দিদল চকিতে সজাগ হইয়া বসিল। কি জানি কেন দীর্ঘশ্বাসও ফেলিল কেউ কেউ। হয়তো বা তাহাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—কত দিন না-দেখা প্রিয়ার মুখ, কচি শিশুটির মুখ, ওই রহস্যমাখা অন্ধকারে মিলাইয়া গেছে বুঝি!

সাইদ আলি দেখে তার হাতের উপর সদ্য-উষ্ণ কয় ফোঁটা জল। তবে ত তাহারা সত্যই আসিয়াছিল!

স্বপ্নেও তবে তো মানুষ আসে! নহিলে তার চোখে তো জল কখনও ঝরে না, সে তো জানে চোখের শিরায় তাহার জল নাই।

চোখ রগড়াইয়া সে ঘুম ছাড়াইতে চাহিল,—চোখের পাতা ভিজা।

চোখের কোণেও কয় ফোঁটা জল জমিয়াছিল। আঙ্গুলের চাপে সে জল গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

সাইদ নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল।

পাষাণের বুকের মধ্যে কোথায় থাকে নির্ঝরিণীধারা, পাষাণ আপনার সে পরিচয় জানে না,—খর মধ্যাহ্নে সে তৃষ্ণায় হা-হা করে।

অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকা হইয়া আসিল। লজ্জিতা জননীর মত আলোক-শিশুটিকে ধরণীর বুকে শোয়াইয়া দিয়া রজনী-মা ধীরে ধীরে বনান্তরালের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল।

আলোকের স্পর্শে চোখের ঘুম টুটিয়া গেল, সাইদ সজাগ হইয়া বসিল। মনটা তখন তাহার ধীরে ধীরে শক্ত হইয়া আসিতেছে। সে একটু হাসিল—আপনাকে ব্যঙ্গ করিয়াই হাসিল।

অন্ধকারে যে আসিয়াছিল—সে ওই অন্ধকারের মধ্যেই ম্লান মুখ লুকাইয়া কোথায় গেল!

ঢং ঢং করিয়া পাঁচটার ঘণ্টা বাজিল।

তখন চারিদিকে রক্ত-আলোর মধ্যে বিশাল প্রাচীর-বেষ্টনী সুস্পষ্টভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীরের রক্ত-রাঙা রং প্রভাত-আলোর আভায় উজ্জ্বল, দীপ্ত! মনে হয় ওই রক্ত-বর্ণটা কাঁচা, সদ্য মাখানো! হয়তো যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কত বন্দীর আত্মা মাথা কুটিয়া ওর সমস্ত অঙ্গ রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে রং আজও বুঝি কাঁচা আছে, বন্দীর দল দৃষ্টি-মাত্রে শিহরিয়া উঠে।

ধীরে ধীরে প্রভাতালোক ঘরের মধ্যেও ফুটিয়া উঠিল। মোটা

মোটা গরাদের ছায়া ক্ষীণ ম্লান রেখায় মেঝের উপর বাঁকা হইয়া জাগিয়া উঠিল।

বাহিরে খটাখট তালা খোলার শব্দ শুনিয়া এবার বন্দীর দল ত্রস্ত হইয়া সারি দিয়া বসিল।

নাল-মারা বুটের শব্দে ঘরখানা ভরিয়া দিয়া খাকী উর্দিপরা প্রহরীর দল কয়েদী গনিয়া গেল—এক, দো, তিন, চার—

গণনা শেষ হইলে বাহিরে ঘণ্টার শব্দ বাজিয়া উঠিল। এবার কয়েদীর দল সারিবন্দী বাহির হইয়া আসিয়া মুক্ত আকাশের তলে সেই সারিবন্দী ভাবেই বসিয়া গেল—বগলে কম্বলের বাণ্ডিল, হাতে থালা বাটি। সিপাহী হাঁকিল,—'সরকার'—

এরা সব পুতুলের মত সেলাম বাজাইয়া গেল।

ততক্ষণে সাইদ আলি বেশ সামলাইয়া লইয়াছে।

সে তখন হাজতী আসামীদের প্রহরায় নিযুক্ত সিপাহীটার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। কৌতুকে সে হাসি কত,—আর সে হাসির রূপই বা কি! বেদনার কণাও যার অন্তরে থাকে সে কখনও এমন হাসি হাসিতে পারে না। আর সে কৌতুক, রজনীর অন্ধকারে স্বপ্নাবরণের মধ্য দিয়া যে ম্লানমুখী নারীটি আসিয়াছিল তাহাকে লইয়াই হয়তো!

জীবনে বেদনাকে কি মানুষ এমনি করিয়া হত্যা করিতে পারে!

ওদিকে দশ নম্বর ওয়ার্ডে জানালার গরাদে ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল একটি সুকুমার কিশোর, পিছনে পিছনে আরও কয়জন,—প্রদীপ্ত শীর্ণ তনু, মুখে মিষ্ট হাসি। এতটুকু ম্লানিমা নাই কোথাও।

সেলাম বাজাইয়া কয়েদীর দল মুখ ধুইতে চলিল সেই সারিবন্দী ভাবে। চলিতে চলিতে ওই বহ্নিশিখার মত প্রোজ্জ্বল মূর্তি-কয়টির পানে ওরা একবার পরম বিস্ময়ে চাহিয়া গেল।

বিচারাধীন রাজ বিদ্রোহীর দল! সম্মুখে দীর্ঘ কারাবাস, তবু ওরা এমন হাসি হাসে কি করিয়া!

বিস্ময় জাগিবারই কথা !

আবার এই নির্মম পাষাণ পুরীকেই বলে—'মুক্তি-মন্দির !'

একজন কয়েদী হয়তো মৃদুস্বরে বলে,—আহা, দুধের ছেলে সব—

আর একজন প্রতিবাদ করে,—আরে ওসব গান্ধীজীর চেলা,—মহীরাবণের বেটা অহিরাবণ। ওরা মাটিতে পড়ে পড়েই লড়াই করে বাবা !

ওদের কণ্ঠস্বরে একটা সম্ভ্রমের আভাস পাওয়া যায়।

দশ নম্বরের ভিতরে তখন একটা হাসির কলরব উঠিয়াছে। ঘুমন্ত একজনকে কম্বলসুদ্ধ ঘরময় টানিয়া লইয়া পায়খানার দরজার গোড়ায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ওদেরই একজন কহিল,—আহা, ঘুমন্ত একজনকে—

যে টানিয়াছিল সে হাত নাড়িয়া বলিল,—উপায় নেই, আইন ইজ আইন। ওর মাঝে দয়ামায়া নেই। সত্যাগ্রহ জেল-আইনে ছ'টার পর ঘুমোলেই তার শাস্তি হচ্ছে কম্বল প্যারেড।

ঘুমন্ত-জন সেইখানে পড়িয়া পড়িয়াই বলিল,—সত্যাগ্রহ করলাম আমি, যতক্ষণ তোমরাই না সরিয়ে দেবে ততক্ষণ সরচি না। সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতার ভঙ্গীতে হাত পা নাড়িয়া শুরু করিল—নড়িব না সূচ্যগ্র মেদিনী যতক্ষণ না সরাইবে তোমরা ;—এই যাঃ, ছন্দ কেটে গেল।

বলিয়া এমন ভাবে হতাশা প্রকাশ করিল যে, সকলে কলরব করিয়া আবার হাসিয়া উঠিল।

ফাইল বন্দী কয়েদীর দল চলিতে চলিতে ওদের পানে সবিস্ময়ে তাকায়। একজন আতঙ্কভরে কহে,—সর্বনেশে হাসি—

অপর একজন মৃদুগুঞ্জনে সায় দেয়,—সর্বনাশী ঘাড়ে চেপেছে যে—

আর একজন,—সত্যি, নইলে কি এমন হাসি মানুষে হাসতে পারে !

দশ নম্বরের ঘর হইতে ভারী গলায় কে কহিল,—উপাসনার সময় হয়েছে, এস তোমরা!

সমস্ত হাসি, চাপল্য এক মুহূর্তে নীরব, সংযত, সংহত হইয়া গেল। শান্ত-পদক্ষেপে ছেলেগুলি ধীরে ধীরে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। গেল না শুধু সেই ছোট ছেলেটি, প্রভাতের প্রথমালোকেই যে আসিয়া গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

শান্ত গম্ভীর সুরে উপাসনার গান ধ্বনিয়া উঠিল।

উপাসনা শেষ হইয়া গেল—এ ছেলেটি তখনও গরাদে ধরিয়া তেমনি দাঁড়াইয়া। আর একটি ছেলে আসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিল,—নরু, একদিন উপাসনায় যোগ দিয়েই দেখ।

—না।

—কিন্তু সত্যাগ্রহী তুমি—

—ঠিক কথা সঞ্জীবদা, তাই আমি অননুভূত কিছুকে সত্য বলে মেনে মাথা নোয়াতে পারি না।

সঞ্জীব স্তব্ধ হইয়া গেল। নরু তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভাত রাগরেখা তাহার রুক্ষ পিঙ্গলাভ চুলের উপর জ্বলজ্বল করিতেছিল। মন্দ বায়ে চুলগুলি মৃদু নাচিতেছিল—যেন ছোট ছোট আগুনের শিখা।

দিন আগাইয়া চলে,—

কয়েদীর দল আপন আপন নির্দিষ্ট কর্মে খাটিয়া যায়। জেলের কারখানার মধ্যে ঘানি ঘোরে, চাকি ঘোরে, ঢেঁকি চলে, ছাপাখানায় কাগজের পর কাগজে কালির হরফ উঠে, সতরঞ্চিতে ফুলের পর ফুল ফোটে, দড়ির দৈর্ঘ্য বাড়িয়াই চলে।

দশ নম্বরের সম্মুখে সেদিন একটা বুড়ো কয়েদীকে ঘাস ছিঁড়িতে দেওয়া হইয়াছে। দারুণ রৌদ্রে সত্য সত্যই তার মাথার ঘাম পায়ের

উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল। পাশেই একটা নিম গাছের ছায়া, বেচারী এদিক ওদিক চাহিয়া ওই ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইল। শীতল ছায়ার স্পর্শ যেন সান্ত্বনা মাখা, ঝলসানো দেহখানা তাহার জুড়াইয়া গেল! মুখ দিয়া আপনি বাহির হইয়া গেল—আঃ! সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের 'চাকি-শেড' হইতে একটা কর্কশ কণ্ঠের বিশ্রী গালি শোনা গেল! বুড়া কয়েদীটা চমকাইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে গিয়া আবার ঘাস ছিঁড়িতে বসিল।

ততক্ষণে 'চাকি-শেড' হইতে সিপাহীটা তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বুড়া ভীত সন্ত্রস্তভাবে আড় চোখে পিছন পানে চাহিতেই সিপাহীর সহিত চোখোচোখি হইয়া গেল—নিষ্ঠুর নির্মম দৃষ্টি! বেচারীর বুকের রক্ত সেই দারুণ উত্তাপের মধ্যেও যেন হিম হইয়া গেল।

সিপাহীটা তাহার কোমরের চামড়ার পেটিটা দু'ভাঁজ করিয়া মুড়িয়া সজোরে বুড়ার পিঠের উপর চালাইয়া দিল—আর, দিল বেশ সহজ ধীরতার সহিত।

কয়েদীটার চোখের জলে, মুখের বিকৃত রেখায় বুকফাটা যাতনার কথা ব্যক্ত হইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া এক বিন্দু আর্তনাদ বাহির হইল না। অন্তরের ও দেহের বেদনা গোপন করিতে বুড়া আরও ঝুঁকিয়া কাজে মন দিল।

দুরন্ত অগ্নিবর্ষণের মধ্যে সিপাহী আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সে 'চাকি-শেডের' তলায় গিয়া মাথার পাগড়ি খুলিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিল।

এতক্ষণে বুড়া কয়েদীটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চোখের জল মুছিবার অবসর পাইল। চোখ মুছিতে মুছিতে সে আপন মনেই আক্রোশভরা নিম্নকণ্ঠে কহিল,—যায় জেলখানাগুলো একদিন ভুঁই-কম্পে ভেঙে চুরমার হয়ে!

দশ নম্বরের জানালার ধারে দাড়াইয়া নরু কহিল,—কি নিলজ্জ লোকটা!

জানালার ধারে দাঁড়াইয়া সে ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তখনও পর্যন্ত তাহার গরাদে-ধরা হাতের মুঠি দুইটি লোহার মতই কঠিন হইয়া আছে।

পিছন হইতে সঞ্জীব কহিল,—অক্ষম দুর্বলের বিদ্রোহ এমনই হয় নরু! এই তার রূপ। দুর্বলের বিদ্রোহ শুধু অভিশাপ আর দীর্ঘশ্বাস!

নরু কিন্তু সঞ্জীবের কথা শোনে নাই, সে ওই বুড়োকেই লক্ষ্য করিতেছিল—

বুড়া ঘাস ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেপাইটাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—তোর আর দোষ কি! আমার পাপের সাজা, অদৃষ্টের ভোগ তো আমাকে ভুগতেই হবে।

নরু কহিল,—শুনচ সঞ্জীবদা?

সঞ্জীব কহিল,—সত্যি কথা ভাই। ওর পাপের সাজা ওকেই ভুগতে হবে।

নরু হাসিয়া কহিল,—পাপ পুণ্যের একটা কল্পিত রেখা টেনে মানুষকে আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখবে সঞ্জীবদা? জুজুর ভয় দেখান শিশুকেই ভাল, মানুষ তার শৈশব অবস্থা পার হয়ে এসেছে।

—তোমার কথা সত্য হোক, ধরণীর স্বপ্ন সার্থক হোক, কিন্তু নরু, তা হবার নয়। যারা শৈশব পার হয়ে এসেছে, তারাই অপরের শৈশব ঠেকিয়ে রেখেছে। নানা বিধানে, শৃঙ্খলে তারা দুনিয়ার শৈশবকে বেঁধে রেখেছে; নইলে যে তাদের বঞ্চনা করা চলে না। এ মানুষের প্রকৃতি, স্বার্থপরতা তার জীবনের ধর্ম। সাপের মুখে বিষ যে দিয়েছে, মানুষের বুকে স্বার্থপরতা সে-ই দিয়েছে। ভগবানের—

—ভগবানের কথা তুল না সঞ্জীবদা। আমি তাকে মানি না।

সেই অন্ধ শক্তিকে মানুষ একদিন নিজের ইচ্ছায় পরিচালিত করবার স্বপ্ন দেখে।

নরুর চোখ দুটি দূর আকাশের নীলিমায় নিবদ্ধ। যেন সে ভবিষ্যতের সেই অনাগত দিনটির দূরত্ব নির্ণয় করিতেছিল।

উত্তরে সঞ্জীব একটা কি বলিতে যাইতেছিল, হরেন আসিয়া সব উলটাইয়া দিল। সে দুইজনের মাঝে পড়িয়া হাত মুখ নাড়িয়া, ভঙ্গী করিয়া কহিল,—যাক্ যাক্, তর্ক করবার আবশ্যক নেই। প্যারাডাইস বুলেটীনের লেটেস্ট সংবাদ হচ্ছে কি জান? 'বিশ্বাসীর জ্বালায় এবং অবিশ্বাসীর ঠেলায় ভগবান ঠিক করিয়াছেন যে, বিশ্বাসীর কাছে তিনি থাকিবেন, এবং অবিশ্বাসীর কাছে তিনি থাকিবেন না।'

তাহার ভঙ্গী দেখিয়া নরু পর্যন্ত হাসিয়া উঠিল!

ভিতর হইতে কে গাহিয়া উঠিল,—"শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী চিরকাল কি রইবে খাড়া?"

হরেন চট্ করিয়া পাদপূরণ করিয়া গাহিয়া উঠিল,—চিরকাল কি খেতে হবে লপ্‌সি এবং পুঁইএর খাড়া? হায় রে কপাল!—বলিয়া সে হতাশভাবে সঞ্জীবের কপালে একটা করাঘাত বসাইয়া দিল।

আবার সেই সর্বনাশা হাসি!

বুড়া কয়েদীটা বিস্মিত হইয়া তাহার হাতের কাজ ভুলিয়া গেল।

নরু ধীরে ধীরে নিজের চরকায় গিয়া বসিল।

দুই

বেদে সাপকে ঝাঁপির ভিতর পুরিয়া রাখে, তার বিষদাঁত ভাঙে, বিষের থলি গালিয়া ফেলে ;—কিন্তু বিষের উৎস তাহার নিঃশেষ হয় না। দিন দিন আবার সে বিন্দু বিন্দু করিয়া সঞ্চয় করে।

দুনিয়ার প্রচলিত বিধানে পাষাণের অবরোধে পাপীকে আবদ্ধ করিয়া শিকলের পেষণে শাসক তাহার পাপকে বিনাশ করিতে চায়। কিন্তু তা হয় না। পাপীর পাপ শাসনে পেষণে নিঃশেষ হয় না, ভয়ে সাপের মত মনের কন্দরে গিয়া লুকায়। শুধু লুকায়ও না, কন্দরের মাঝে আহত সাপের মতই আক্রোশে গর্জায়। বিষকে অমৃতে পরিণত করিবার উপায় মানুষের বুঝি আজও জানা নাই। যদিবা জানা থাকে, তবে শক্তির মত্ততায় শাসন প্রয়োগের প্রলোভন সে ত্যাগ করিতে পারে না। তাই দাগী চোর জেল খাটিয়া ঘাগী হইয়া ফিরে।

পশ্চিম দিকের প্রাচীরের গায়ে নেবু বাগান। নেবু গাছের নিবিড়তার মধ্যখানে বেশ একটু গোপন স্থান। সেখানটিতে প্রাচীরের গায়ে সাইদ আলি উপুড় হইয়া ঝুঁকিয়া গলায় আঙ্গুল দিয়া বমি করিতেছিল, আর এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। গলায় আঙ্গুল দিতেছিল কিন্তু এমন ভাবে যেন শব্দ না হয়। মুখ হইতে বাহির হইল সিকি, দু'আনি, হাফ গিনি কয়টা। গলায় ওর থলি আছে।

পাপের বোঝা গলায় বাঁধিয়া মানুষ মরণের বুকে ডুবিবে, তবু ত্যাগ করিতে পারিবে না!

একটা সিকি রাখিয়া বাকীগুলা সব আবার সে মুখে পুরিয়া বিচিত্র কৌশলে গলায় থলির মধ্যে রাখিয়া দিল।

হাসপাতালের ফটকে একটা কালা-পাগড়ি পাহারা দিতেছিল, তাহার কাছে আসিয়া সাইদ আলি কহিল,—মাল নিকালো—

কালা পাগড়ি দশ বিশ বছরের আসামী। এখন সে সিপাহী হইয়াছে। মাসে চার আনা তলপ। কালা-পাগড়ি পকেট চাপড়াইয়া হাত পাতিল।

সাইদ হাসিয়া সিকিটা দেখাইল, দিল না। কহিল,—একবার একটা সিকি মেরে দিয়েছে একজন। থো কড়ি খা পিঠে, বাবা, এক হাতে দাও—এক হাতে নাও।

দাঁত মেলিয়া কালা-পাগড়ি কহিল,—বহুত হুঁশিয়ার হো তু সাইদ আলি!

সাইদ আলি কহিল,—এবারকার রোগী ফেরবারকার ওঝা। দাদা, বের কর এক বাণ্ডিল বিড়ি, শিবের জটা চার পয়সা, একটা দেশলাই।

কালা-পাগড়ি হিসাব করে—তিন পয়সা বিড়ি, চার গো জটা, হুয়া সাত, আউর মাচিস এক পয়সা, আঠ, আঠ দোনা ষোলা পয়সা—চার আনা। ঠিক ঠিকসে নিকালকে লে আয়া! নিকাল না আওর একগো চৌ-নি, সাইদ আলি!

সাইদ আলি সরিয়া গিয়া তফাৎ হইতে কহিল,—বাবা, এক টাকার মাল দু'টাকায় বেচছ, আবার?

কালা-পাগড়ি হাসিয়া, পাগড়ি পকেট কোমর হইতে বাহির করিল গাঁজা, বিড়ি, দেশলাই। মুখে বলিল,—ই-তো জেলখানাকে রুল হ্যায়,—দুনা দাম। জাস্তি তুম কেয়া দিয়া? হামকোভি তো দেনে হোগা!

জিনিসগুলা লইয়া সাইদ আলি বলিল,—হাতকে রুলকে গুতোর চোটে রুল তো বানায়া সব, আর হাম কিছু দানছত্র খুলা নেহি।

সাইদ আলি টুপি খুলিয়া মাথায় বিড়ি দেশালাই রাখিয়া টুপিটা চাপা দিল ও গাঁজার পুরিয়াটা রাখিল কোমরে, পেটির নীচে। সেও মেট—সৎ কয়েদী, সিপাহী হইয়াছে। চামড়ার পেটিও একটা মিলিয়াছে।

—সেলাম, কামমে যাতা, বলিয়া সে সরিয়া পড়িতে চাহিল।

কালা-পাগড়ি বলিল—বৈঠ না থোড়া, তু তো মেট হো।

—তোমার কি বল ? আসামীদের কাজ না হলে তখন তুমিই দেবে ঠাণ্ডা গারদ। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ও মাথায় নেবু গাছের তলা সাফ করিতেছিল একটা ছেলে ; বছর পনের বয়স, মাথায় লম্বা চুল, কাল ঠোঁট, বসা চোখ, দীপ্তি তার ম্লান। শহরের চোয়াড়ে ছেলে। পকেট কাটায় চার মাস মেয়াদ হইয়াছে। আগে আরও বার তিনেক সে জেল ফিরিয়া গিয়াছে। কোন বিষণ্ণতা নাই, হেলিয়া দুলিয়া আবদারের ভঙ্গীতে ঘোরে ফেরে, আর বলে,—বেশ জায়গা এ মাইরি, দিব্যি পাকা ঘর, তকতকে উঠোন। আর অভাবই-বা কিসের ? দে মাইরি আমার পিঠটা চুলকে। একটা বিড়ি দেনা ভাই—দিবি না, আচ্ছা! বলিয়া সে ঠোঁট ফুলায়।

সাইদ আলি ওর কাছে আসিয়া কহিল,—বিড়ি খাবি ?

ছেলেটা যেন এলাইয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া দিল,—একটু কামও করে দে-না মাইরি।

সাইদ আলি ওর কাজ করিতে বসিল। ছেলেটা বিড়ি টানিতে টানিতে ওর পিঠে চিমটি কাটিয়া দিল। সাইদ আলি চমকাইয়া কহিল,—উঃ।

ছেলেটা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সাইদ আলি কাজ ফেলিয়া ওর দিকে ফিরিয়া কহিল,—আচ্ছা, আয় গল্প করি দুটো। তোর কথা বল। তোর বাপ মা—

—কে জানে মোর বাপ মা! মা বেটী রাস্তায় ফেলে সরেছে না মরেছে সে হারামজাদীই জানে। আর বাবা, দেখিইনি, তা তার নাম ধাম! বাবা আসত যেত গুলি খেত, মাথা দেখিনি। বলিয়া হাসে।

—পকেট-মারার দলে কদ্দিন আছিস?

ছেলেটা শুইয়া শুইয়া দিব্য বলিয়া যায়,—সে সাত বছর বয়সে। ওস্তাদজী বলে কি জানিস্? বলে, সোনায় তোর হাত বাঁধিয়ে দেব। দেখ দেখি হাতখানা ক্যায়সা পাতলা! শালা আঙ্গুল তো নয় যেন পালক, গায়ে হাত দিলে জানতেই পারবি না। বলিয়া ওর গায়ে হাত দিয়া যেন পরীক্ষা দিতে চাহিল!

সাইদ বলিল,—চারবার ধরা পড়লি কেন?

—তুই ধরা পড়লি কেন? ও ধরা পড়ে যায়,—বুঝলি? জানিস্, একবার সেপটী ক্ষুরের বেলেড দিয়ে চোরা পাকিট শালা এ্যাইসা চির দিলাম,—দু'হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল পাকা আমের মত হাতে এসে পড়ল। জানিস্, বুক চিরে তোর জান নিক্‌লে লোব, তুই জানতেও পারবি না। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

—দেখি তোর হাত,—পকেট মারতে কেমন পারিস? বলিয়া ওর হাতখানা সাইদ আপন মুঠোর মধ্যে পুরিয়া চাপ দেয়।

ছেলেটা হাসিয়া কহিল, ছাড়, লাগে! দূর—শুধু বিড়ি! এই লে তোর বিড়ি, বলিয়া পোড়া বিড়িটা সাইদের গায়ে ছুড়িয়া মারিল।

সাইদ আলি কহিল,—দুধ খাবি? আয়, হাসপাতালের চৌকোয় চারটে বিড়ি দিলেই দুধ মিলবে।

ছোঁড়াটা উঠিয়া চলিতে চলিতে সাইদকে ঠেলা দিয়া কহিল,—একটা সিটি মারব মাইরি,—ভারী মন করচে।

—না না। জেলখানাতে যা করবি শালা চুপি চুপি। দেখিয়ে কিছু না,—চেঁচিয়ে কিছু না! জেলখানা—না গুমখানা।

—জানিস মাইরি, এ্যাসা সিটি মারব ভর্‌র্‌সে যে, সব শালা সেপাই ছুটে আসবে সত্যি সিটি ভেবে।

সাইদ আলি ছেলেটার হাতে আর একটা চাপ দিয়া কহিল,—তুই একটা জহরৎ রে!

ছোঁড়া কহিল,—গলায় ঝুলিয়ে রাখ তুই।

হাসপাতালের চৌকা হইতে ফিরিয়া সাইদ কহিল,—তুই বোস্ মাইরি, আমি একটা হাজতী আসামীর সাথে দেখা করে আসি। কবুল খাবে শালা।

—কোন বে রে? তোর দলের?

—না, কোন্ দলের কে জানে। তবু শালাকে দেখি যদি সামলাতে পারি।

—এখুনি সব আদালতে যাবে বুঝি?

—শুনলি না—দশটা বাজল।

—যা। বলবি শালাকে, জান যাবে কবুল করলে। আমাকে দেখাস তো শালাকে।

—দেখবি কি, কবুলী আসামী থাকে যে ডিগ্রীতে, পাছে কেউ বিগড়ে দেয়।

ওদিকে মটরের হর্ন শোনা যাইতেছিল।

ছেলেটা বলিল,—ওই ভ্যাঁক্ ভ্যাঁক্ করচে, যা জলদি।

সাইদ আলি চলিল রান্নাশালায়। ছোঁড়াটা ঘাস ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে আপন মনে গান ধরিল,—মৃদুস্বরে।

গৌর দাস রান্নাশালের মেট, লম্বা মেয়াদের আসামী, পাকা

লোক। সাইদ গিয়া কহিল,—ডাক্তার বাবু বলছিল এখানে ঘাস হয়েছে, মাছি হবে।

গৌর হাসিয়া কহিল,—ভয় নেই, সেপাই গেছে গুদমে।

সাইদ'ও হাসিল, বলিল,—ডিগ্রীতে গিয়েছিলে ?

—হ্যাঁ, ভাত দিয়ে এলাম। বলে এলাম শালাকে।

—সেপাই ঢোকেনি পিছু পিছু ?

—ঢুকেছিল। আমি ঘরে ঢুকেই বললাম,—উঃ, কি গন্ধ ঘরে ! শালা আর ঘরে ঢুকল না। ওকে বললাম.—দেখ, কবুলই কর আর যাই কর, তোকে জেলে দেবেই। কেন মিছামিছি কবুল করে দলসুদ্ধ ফাঁসাবি ? দল বেঁচে থাকলে তোর মাগ ছেলের একটা হিল্লে হবে। বেরিয়ে একটা আশ্রয় পাবি।

—কি বললে ?

—চুপ করে রইল। তখন শাসিয়ে দিলাম কি,—শালা কবুল করলেও তোমার জেল, খালাস হবে না। তখন এখানে আসতেই হবে। এসে পড়বে আমাদের হাতে—বুঝবে তখন ! খাড়া-হাতকড়ি পরিয়ে রেখে দেব দুটি মাস। তখন বেটা বললে,—না না, আমি কবুল করব না। দাও—দাও, লোক দুটো লাগিয়ে দাও এখানে। ঘাস দেখে সাহেব চটে যাবে। বল না সিপাইজী, পরিষ্কার করে দিতে !

সিপাহী আসিয়া পড়িয়াছিল। গৌর দাসের কথা শুনিয়া কহিল, —দেও, দুটো আসামী হিয়া দে দেও।

ওদিকে মোটরের হর্ন বাজে ঘন ঘন।

দশ নম্বরের ছেলে কয়টিও চলিয়াছে, ওদেরও আজ বিচার হইবে। চারি-দিক-ঢাকা জেলের মোটরবাস। চালকের পাশে সশস্ত্র প্রহরী, দ্বারে প্রহরী, ভিতরে প্রহরী—উদ্যতাস্ত্র।

বাসে বসিয়াই সঞ্জীব আপন মনে গান ধরিয়াছে,—

বেলা তিনটায় সকল কয়েদী আপন কাজের হিসাব লইয়া দাঁড়াইল। কেষ্ট দাস চুরির আসামী, দু'বছর মেয়াদ হইয়াছে। বাইশ তেইশ বয়স—মুখখানি বেশ ডগডগে। কিন্তু বুকের পাঁজরা এক একখানি করিয়া গনা যায়। বেচারী বলে—কি করব, রোজ জ্বর হয়।

গৌর উপদেশ দেয়,—হাসপাতালে যা।

—তা কি যাইনি! ওরা বিশ্বাস করে না।

—যা, তুই ফের যা।

কেষ্ট হয়তো ফের হাসপাতালে যায়।

—ডাক্তার বাবু, হুজুর হাতটা দেখুন।

ডাক্তার শাসাইয়া বলেন,—হাসপাতালে যাবার মতলব!

কেস্ট দাস করুণ স্বরে উত্তর দেয়,—আজ্ঞে না, দেখুন—গা গরম।

—রোদ্দুরে গা গরম করেচ, এ্যা? ললিত, এরে এক দাগ দাও তো!

ললিত কম্পাউণ্ডার। সে ওর মুখে এক দাগ কুইনিন মিকশ্চার ঢালিয়া দেয়।

ডাক্তার ব্যবস্থা করেন,—কাল সাবু পাবি, আজ ভাত খাস্ গিয়ে। হিসেব আমি কাটতে নারি ফের।

বিকৃত মুখে কেস্ট দাস ফিরিতে ফিরিতে বলে,—দড়ি একগাছা পাই তো গলায় দি।

আবার নিজের বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে,—মরবো তো শীগগিরই। বুক হয়েছে দেখ না, যেন ফুটো হাপর। তখন কি করবি শালারা! কাকে খাটাবি, চোখ রাঙাবি? মেথর ফেলবে? তাই ফেলে যেন, আমার বয়েই যাবে।

তিন

কেষ্ট দাসের আজ কাজ পূরা হয় নাই, সে গম পিষিয়া শেষ করিতে পারে নাই। জমাদার কৈফিয়ত চাহিল,—রোজ তেরা এহি হাল ?

কেষ্ট সভয়ে জবাব দিতে গেল,—আজ্ঞে, জ্বরে হুজুর—

জমাদার একটা পেটি কষিয়া বলিল,—জ্বর ভাগ যায়েগা। দোসরা রোজ হাম ছোড়বে না, আপিসমে লিয়ে যাবে।

কেষ্ট দাস মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সরিয়া আসিল।

পেশী ফুলাইয়া সাইদ আলি দাঁত কস্ কস্ করিতে করিতে বলিল, —আমাকে মারুক তো! কি বলব, এটা জেলখানা, নইলে বেটা ছাতু—

একটু থামিয়া আবার বিরক্তিভরে কহে,—আরে ই-শালালোক যে ভয়ে পেছোয়, নেহি তো—

এ পাশ হইতে ছেলেটা বলিল,—আরে তু ভি তো ভাগচিস, তু সক্‌বি ?

—আলবৎ। আমাকে মারুক না দেখি ? পরের জন্যে কে হাঙ্গামা করে ?

গৌর বলিল,—রাক্ষস বেটারা একটা রোগা লোককে—

—চুপ কর ভাই, শুনলে আবার আমার বিপদ। যা বলেছিস সেই ঢের। আমাকে বেশী লাগেও নাই। বলিয়া কেষ্ট হাসিতে চেষ্টা করে। বলে,—দিন একদিন আসবেরে,—বেরুব তো একদিন !

ওই একটা দিনের আশাই এদের দুর্বহ জীবনকে সম্মুখের পথে টানিয়া লইয়া চলে। যখনই সুযোগ ও সময় মেলে ফটকটার ঘুলঘুলি দিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বুঝি দেখে—সেদিন আর কতদূর !

কেষ্ট কহে,—ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দেখলে তবু মনে হয় একদিন বেরুব।

গৌর বলে,—দূ-রো, ও আমি ভাবিই না। যখন মন হবে ওদের, তখন ছাড়বে।

সাইদ বসিয়া তখন মার্কার হিসাব করে, গৌরও বসিয়া যায়।

—বছরে তিন মাস। সাত বছরে তিন সাতে একুশ মাস। খাটা হল—এক বছর আট মাস।

মাটিতে খোলা দিয়া যোগ করে। একুশ আটে উনত্রিশ,—দু'বছর পাঁচ মাস—আর এক বছর, হল গিয়ে তিন বছর পাঁচ মাস। দূ-রো, ঢের বাকী।

কেষ্ট বলে,—আমার আর এক বছর দু'মাস ন'দিন।

সাইদ আপন হিসাবের অঙ্ক হাত দিয়া মুছিয়া একাকার করিয়া দেয়, ওর সেদিন হিসাব ধরা পড়ে না বুঝি।

বড় ফটক খুলিয়া নতুন আসামী আসিল ক'জন।

সাইদ জিজ্ঞাসা করিল,—কোন্ কেলাস ভাই?

দাঁত উঁচু কালো জোয়ানটি উত্তর দিল,—চওড়া আছে দাদা—"বি"।

আর ক'জন নতুন লোক, তাহারা এদের মুখপানে চাহিয়া রহিল। গৌর হাসিয়া বলিল, এরা বুঝি নতুন লোক?

সাইদ তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করিল,—কি, ধান চুরি নাকি?

এতক্ষণে একটা ছোকরা ওপাশ হইতে দম্ভভরে উত্তর করিল,—ডাকাতি।

গৌর হাসিয়া কহিল,—বহুৎ আচ্ছা! মরদ হ্যায়!

সহসা সাইদ বলিয়া উঠিল,—আরে আরে, ও কেরে! ফের-বেটা গুলি-খোর এসেচে,—ফুরুমিঞা এসেছে যে ফের।

ফুরুমিঞার মাথায় ফুলদার টুপি, পরনে লুঙ্গি, গায়ে একটা কোট। কটা চুল, কটা চোখ—রংটাও কটা ছিল, এখন তামাটে। মুখে ওর এক মুখ হাসি। ফটকের মুখ হইতেই ভুরু ঘন ঘন নাড়িতেছিল, ঘাড় দুলিতেছিল, ইশারায় ও সবার সাথে আলাপন সারিয়া লইয়াছে।

গুদামের জমাদারও ফুরুকে দেখিয়া হাসিয়া কহিল,—কেয়া, ফিন ঘুমকে আয়া?

এক মুখ হাসির সাথে সেলাম জানাইয়া ফুরু উত্তর করিল,—জী হুজুর,—

—আরে, আভিতো পঁদরা রোজ নেহি হুয়া তুম নিক্‌লা হিঁয়াসে।

—হ্যাঁ হুজুর, রইতে নারলাম।

—কেয়া কিয়া ই-দফে?

—করব আর কি, পয়সা ছিল না, একজনদের বাসন ছিল ঘাটে, একটা বাটি তুলে নিয়েছিলাম। বলিয়া বেশ কৌতুকভরে হাসিতে লাগিল।

ওদিকে নতুন আসামীদের খবরদারকারী সিপাহী হাঁকিল,—এ শালা বদমাশ, আও আও।

—আসি হুজুর, দেখা তো হবেই, রইলামই তো।

ফুরুমিঞা ইশারায় ভুরু নাচাইয়া সবার সঙ্গে আবার কথা সারিয়া লইল। যাইতে যাইতে গুনগুন করিয়া গান ধরিল,—

'সইরে আমার—মনের কথা বলে আসা হ-ল না'—

বিরহ কাতর-আঁখি, ম্লানমুখী কোন সখীর স্মৃতি ওর বুকে জাগে কি?

দাঁত-উঁচু জোয়ানটি হাসিয়া ফুরুর হাতে একটা চিমটি কাটিয়া দিল। ফুরু গান ছাড়িয়া দিল,—উঃ।

দাঁত-উঁচু লোকটি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বউয়ের জন্যে মন কেমন করচে?

ফুরু এবার সশব্দে হাসিয়া উঠিল,— হি—হি—হি ; সিপাহী ধমক দিল,—এই উল্লু !

ফুরু সেলাম জানাইয়া বলিল,—সেলাম হুজুর, এ ব্যাটার বাড়ির জন্যে মন কেমন করচে,— তাই হেসে ফেলেচি।

জোয়ানটি চুপি চুপি কহিল,—তোর না আমার ?

ফুরু বুড়া আঙ্গুল নাড়িয়া জবাব দিল,—খট্ খট্ লবডঙ্কা। বউই নাই তো মন কিসের রে শালা ? দোসরা দফে যখন দু'বছর মেয়াদ খাটি, তখনই সে পথ দেখেছে,— নেকা করেচে। ওটা গানের গান। শোন্—শোন্, শেষটা শোন্—

'আমি তো-মায় ভুল-ব নাক, তু-মি যে-ন ভু-লনা'—

ডাকাতির নতুন আসামীটি আপন মনেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বিচারাধীন আসামী কয়টিও ফেলে।

কেমন যেন বিষণ্ণ ভাব। শুধু সেই ছেলেটি—নরু ছাড়া সকলে নীরবে রাঙা সুরকি বিছানো পথ বহিয়া চলিয়াছে। সকলের অঙ্গে কয়েদীর পোশাক।

মধ্যপথে একজন সিপাহী নরুকে বলিল,—আপ চলিয়ে ডিগ্রীমে।

ওদের বিচার হইয়া গেছে, বিচারে নরুর তিন বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। আবার জেল-গেটে আসিয়া জেল-পোশাক পরিবার সময় এক ঝগড়া বাধাইয়াছিল, তাহার জন্য ওকে পৃথক রাখার হুকুম হইয়াছে।

—আসি দাদা, বলিয়া নরু এদের কাছে বিদায় লইয়া চলিল ডিগ্রীতে।

এরা চলিল সব দশ নম্বরে।

চার

এদিকে কেষ্ট দাসের প্রহার লইয়া ওদের মধ্যে উষ্ণ আলোচনা তখনও শেষ হয় নাই। সবাই একটু প্রখর হইয়া নিজেদের মধ্যে তখনও জটলা পাকাইতেছে।

ওদিকে ঘণ্টা পড়িল,—ঢং ঢং ঢং—

সেই সঙ্গে ওদের ঐক্য ভাঙ্গিয়া গেল—অভ্যাস বশে সংকেতের আদেশে সবাই উঠিয়া পড়িল।

প্রতি মানব-মনে যে বিদ্রোহী বাস করে, সে বুঝি জাগিবার অবকাশ পায় না। একখানা শিকলে যেন সব গাঁথা, আর সে শিকলখানা অতি দ্রুত-আবর্তনে আবর্তিত হইতেছে, এতটুকুখানি পাশে সরিয়া যাইবার অবকাশ নাই, সারিবন্দী উঠা, সারিবন্দী বসা, সারিবন্দী চলা, সারিবন্দী খাওয়া। প্রত্যেক কর্মটি যন্ত্রের মত ঘণ্টার সংকেতে নিয়ন্ত্রিত। চিন্তা করিবার, বুক বাঁধিবার মুহূর্ত অবকাশ নাই। জীবনটা যেন যন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে।

সব আসিয়া জোড়া জোড়া সারিবন্দী বসিয়া গেল—সম্মুখে থালা আর বাটি।

গৌর দাস পরিবেশন করে—রাঙা রাঙা ভাত এক বাটি, মসুরির ডাল এক ডাবুয়া, তরকারি এক ছটাক, আর খানিকটা নুন।

তাও এতটুকু পড়িয়া থাকে না; সকলে গো-গ্রাসে গিলিয়া চলে।

সাইদ আলি চোকা হইতে চুরি-করা রুটি বাহির করিয়া ছেলেটাকে দিয়া কহিল,—শীগগির খেয়ে নে। আরও দিল এক টুকরা পেঁয়াজ, আধখানা লঙ্কা।

সম্মুখেই বসিয়া কেষ্ট দাস কাঙালীর মত ছেলেটার আহারের পানে

তাকাইয়াছিল, এবার সসংকোচে বলিয়া ফেলিল,—খানিকটা লঙ্কা দে না ভাই, জ্বরোমুখে কিছু ভাল লাগছে না!

সাইদ আলি অম্লান বদনে খাইয়া চলিল, ওর কথা যেন কানেই যায় নাই।

কেষ্ট আবার ডাকিল,—সাইদ মিঞা—

সাইদ স্বচ্ছন্দে ওর চোখে চোখ রাখিয়া রুটি চিবাইতে চিবাইতে বেশ বুঝাইয়া বলিল,—জানিস, এটা জেলখানা—

ছেলেটা খানিকটা পেঁয়াজ, লঙ্কা, আর আধখানা রুটি কেষ্টকে দিয়া সাইদ আলিকে বলিল,—আহা জ্বর হয়েচে, ভাত খেলে আরও বাড়বে।

সাইদ আলি জবাব দিল না, আপন মনে খাইয়াই চলিল।

কেষ্ট সভয়ে রুটি আর পেঁয়াজ ছেলেটাকে ফেরত দিতে গেল —না না, রুটি আমি খাব না, এই পেঁয়াজই আমার ঢের।

ছেলেটা বলিল,—আমার মাথার দিব্যি, তুই খা।

সাইদ আলির চোখের দৃষ্টিটা হইয়া উঠিল যেন সাপের দৃষ্টি, নিমেষহীন, ভাবলেশহীন।

কেষ্ট দাস যেন ভয়ে মরিয়া গেল।

খাওয়া হইয়া গেল, আবার ঘণ্টা পড়িল।

সিপাহী হাঁকিল,—সরকার—

ওরা আবার সেলাম বাজাইল।

আবার ঘণ্টা,—ওরা থালা বাটি তোলায় লাগিয়া গেল।

আবার ঘণ্টা। এবার ওরা সেই লাইনবন্দী চলে চৌবাচ্চায়—থালা বাটি পরিষ্কারে। সেখানেও তাই, ঘণ্টার সংকেতে বসে, ঘণ্টার সংকেতে জল তুলিয়া ধোয়, আবার ঘণ্টার সংকেতে উঠিয়া আসিয়া একে একে ঘরের সম্মুখে সেই ফাইলবন্দী বসিয়া যায়।

মেট গনিয়া যায়,—এক, দুই, তিন, চার। শেষে হাঁকে, চব্বিশ জোড়া, আটচল্লিশ আসামী।

এর পর জমাদার নাম ডাকে,—ওরা হাজির হাঁকে।

শেষ হইলে মেট আবার হাঁকে—সরকার—

ওরা সেলাম বাজায়।

তারপর সারিবন্দী পিপীলিকার মত ঘরে ঢুকিয়া যায়।

সিপাই দরজা বন্ধ করে, জমাদার চাবি বন্ধ করে, চীফ্‌হেড্‌ ওয়ার্ডার আসিয়া তালাগুলাকে সবলে টানিয়া দেখিয়া যায়; তখনও বাহিরে ঘোরে প্রহরী।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ওদের মূর্তি পালটাইয়া যায়। তুবড়িতে যেন আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ওদের ভিতরের গুপ্ত ফানুসটি যেন রং বেরংএর ফুলঝুরির হররা ছুটাইয়া বাহির হইতে থাকে।

প্রথমেই এক দফা নৃত্য শুরু হইয়া যায়,—খেমটা, ঝুমুর, সাঁওতালী, আবার নাম না-দেওয়া কত নাচ। সবাই নাচে, দর্শক কেহ নাই। রোগা কেষ্টলাল, সেও মাথায় হাত দিয়া কোমর ঘুরাইয়া নাচিয়া বেড়ায়। নাচ থামিলে, সব আপন আপন বিছানা পাতিতে বসে। কম্বল ঝাড়ার একটা সাড়া পড়িয়া যায়।

আটচল্লিশখানা কম্বল এক সঙ্গে বেতালা শব্দ করে—ফটাং ফটাং। প্রতিধ্বনিতে ঘর ভরিয়া যায়।

ঘরের মধ্যে চারিটা বড় বড় জানালা, একটা জানালার ধার সাইদের, একটা গৌরের, একটা তহিদের, একটা জোবেদের।

তহিদ ডাকাতির আসামী। জোবেদও তাই।

সাইদ আলির পাশেই সেই ছেলেটা থাকে, সে বিছানায় বসিয়া বলিল,—বিড়ি দে।

সাইদ চুপ করিয়া রহিল, কথা বলিল না।

—রাগ করেছিস মাইরি?

সাইদ তথাপি চুপ, ছেলেটা হাসিতে লাগিল। সহসা সাইদ বলিয়া

উঠিল,—দেব শালা রোগা পটকার জান একদিন মেরে,—তোর কাছ থেকে ফের যদি কিছু নেবে।

—আমি যে দিলাম—

—ও নেবে কেন? আমাকে চাইলেই তো দিতাম।

—তুই দিলি কই?

—না, দিলে না,—শালা পটল তুলবে এই রোগের ওপর খেয়ে।

ছেলেটা অনর্গল হাসিতে লাগিল। সাইদ আবার বলিল,—দেখিস আমি বললাম, বত্রিশটা দাঁত আমার,—আমার কথা ফলবেই। ও শালা এইখানেই থাকবে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি আর ওকে দেব না। তুই দিবি তো?

—জরুর! ও বেচারা রোগা! আমি কি পাথর যে, চাইলে দেব না। নে, বিড়ি নে। এই কেষ্টা শোন।

কেষ্ট সভয়ে আগাইয়া আসিল। ওকে একটা বিড়ি দিয়া সাইদ আলি বলিল,—বিড়ি খা। বোস্ একটান মালও পাবি—

ও কি বাহির করিয়া টিপিয়া বিড়ির মধ্যে পুরিল।

ওপাশে ঠিক তাই করে গৌরদাস। বিড়িটা খাইয়া গৌর কেমন ভাম হইয়া বসিল। সহসা সমাগত সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার ভেদিয়া ওর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল ঘর বাড়ি, একটি নারীর স্মিত হাসি, মনে পড়িল ছোট একটি ছেলের দুরন্তপনা, মনে পড়িল—

পাশের বুড়া সাওতালটাকে ডাকিয়া বলিল,—মাঝী!

মাঝীর নয়নে তখন ঘুমঘোর চাপিয়াছে। সে শুধু উত্তর করিল,—উ!

ওই এতটুকু ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত উত্তর পাইয়াই গৌর বলিয়া চলিল,—আমার ছেলের কথা বলছিলাম মাঝী, এমন ছেলে আর হয় না! বুঝলি মাঝী! পথের পথিকে ডেকে কোলে করে। ফরসা নয়, তবু দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। ছেলেটারও কি, একেবারে কান্না নেই! যে হাত পাতবে তারই কোলে যাবে। তুই যখন বাড়ি যাবি

তখন আমার বাড়ি হয়ে যাস। ওখানে খাবি, দেখবি আমার ছেলে কেমন, পরিবার কেমন লোক দেখবি। হাসি মুখে লেগেই আছে।

এইখানে সে একবার নীরব হইয়া গেল। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া চলিল,—তারা কি আর আছেরে, হয়তো শুকিয়ে আধখানা হয়ে গিয়েছে। তাও তুই যদি আমার খবর নিয়ে যাস—কত যত্ন আত্মি করবে দেখবি তোকে।

মাঝী কোন উত্তর দিল না, গৌরও নীরবে জানালার বাহিরের পানে শূন্য মনে চাহিয়া রহিল।

অন্ধকার! শুধু জানালার ফাঁক দিয়া একটা ক্ষীণ দীর্ঘ আলোকের ধারা দিবসের বুকে ছায়ার মত লাগিয়া আছে। কালো আকাশে অগণ্য তারা ঝিকমিক করিতেছে। প্রাচীরের ওপারে বাগানের বড় বড় গাছগুলা নিবিড়তর পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত মনে হয়। গরাদের ওপাশেও সবই অন্ধকার, প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ! যেন এই জেলখানা ছাড়া আর বিশ্বের কিছু নাই! এই গারদখানাটা বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, দুইএর মধ্যে এক বিরাট তমসা-প্রবাহের ব্যবধান!

মাঝে মাঝে আলোকের একটা রেশ জাগাইয়া এক জোড়া বুটের শব্দ একটার পর একটা শোনা যায়। সান্ত্রী পাহারা দেয়, এক পাশ হইতে আর এক পাশ পর্যন্ত বাতি হাতে অবিশ্রাম চলিয়াছে,—খট্ খট্ খট্ খট্,—একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তরে, নির্দিষ্ট তালে।

সান্ত্রী কাছে আসিতেই গৌরের চমক ভাঙ্গিল, সে কহিল,—মাঝী ঘুমোলি?

মাঝী উত্তর দিল,—হুঁ।

তার ঘুমে জাগরণে গৌরের কিছু আসে যায় না। সে বলিয়াই চলিল,—দেখবি আমার ঘর দোর, আর এক জোড়া বলদ যা আছে আমার—ইয়া হাতির মত। একটা সাদা, একটা কাল, গলায় আবার লাল রঙের বনাতের ওপর ঘুঙরে-ঘণ্টায় গাঁথা মালা! গাড়ি যখন

চলে, তখন এ্যাসা তালে তালে বাজে যেন বাই নাচচে, থর না গান তার সঙ্গে। আমার পরিবার তার সেবা করে নিজের হাতে। ভাতটি, মাড়টি, তরকারির খোসাটি দিচ্ছেই ডাবাতে—দিচ্ছেই। গরু দুটোও কি তার বশ! আমাকে মাথা নাড়ে, কাল রঙের কিছু দেখলে তো চার পায়ে লাফায়। কিন্তু যেই লাল পেড়ে শাড়ির আঁচলটুকু দোরের গোড়ায় দেখতে পেয়েছে, অমনি মুখ তুলে দাঁড়াল। কিছু নাই তো সে শুধু হাতই বাড়িয়ে দেয়—তাই চেটেই ওদের সুখ।

গৌরের কথা আর চলিল না, ঘরে তখন কবিগান আরম্ভ হইয়া গেছে।

বিড়িটা টানিয়া কেষ্ট একটু চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। বলিল,—আমি আজ কবি গাইব সাইদ মিঞা।

—তুই পারবি?

—দেখ, জ্বরে কাবু হয়ে থাকি তাই। আমি খুব গাইতে পারি।

সাইদ বলিল,—বহুত আচ্ছা।

ছোকরাটা উঠিয়া মজলিস বানাইতে লাগিয়া গেল।

কেষ্ট বসিয়া বসিয়া গান ভাঁজিতে লাগিল।

ওপাশ হইতে উঠিল চৈতনা। সে বলিল,—আমি গাইব।

গণশা বলিল,—কেষ্টা জানে কি,—আমি গাইব।

সাইদ বলিল,—খবরদার, আজ কেষ্টা গাইবে—ও একটা হীরে। লাগ তোরা একে একে।

কবিগান আরম্ভ হইল। মাঝখানে গান—চারিদিকে সব ঘিরিয়া বসিয়াছে। বিচারক হইল সাইদ, গৌর, তহিদ আর জোবেদ।

কেষ্ট কোমরে হাত দিয়ে নাচের সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় গান ধরিল—

> জেলের মধ্যে কবিগান হয়ই বারো মাস,
> গণশা শালার বদলে আজ গাবেন কেষ্টদাস,—
> আপনারা দেবেন গো সাবাস্।

ছোকরা চেঁচাইয়া উঠিল,—সাবাস্—সাবাস্—

সাইদ বলিল,—বহুত আচ্ছা !

গৌরেরও উদাস ভাব কাটিয়া গেল, সে কহিল,—বেটা মানিকরে আমার।

গণশা রাগিয়া গেল, শ্রোতারা হাসিতে লাগিল—চুপি চুপি, সন্ত্রস্তভাবে।

সান্ত্রী পার হইয়া গেল, বলিল,—ঠিক হ্যায়।

লালমারা জুতার শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল।

কেষ্ট আবার গান ধরিল—

আজকে আমি রাবণ রাজা চৈতনা আজ মন্দোদরী,
গোঁফ দুটো ভাই দাও কামিয়ে তবেই প্রেমের ছন্দ ধরি।

হাসির হর্‌রা বহিয়া গেল।

সহসা সাইদ হাঁকিল—চোপ, চোপ। আবার নিম্ন কণ্ঠে কহিল,—গান চালাও, ও নিয়ম রক্ষে।

গান চলিল। কেষ্ট প্রশ্ন করিয়া যায়, চৈতন্য উঠিয়া গান ধরিয়া রসিকতার পালটা জবাব দেয়—

গোঁফ কামিয়ে মন্দোদরী করবে মুড়ো ঝাঁটা,
পরের নারী হরণ করার দেখাবে মজাটা।

সবাই হাসিতে লাগিল, গণশা খুব বেশী।

কেষ্টর প্রশ্নের জবাবটা কিন্তু ও ভাল করিয়া দিতে পারিল না, গোলমালে সারিয়া দিল।

কেষ্ট পালটা গাহিল—

কবি করতে আলি চৈতনা
তবু কি তোর গেয়ান হৈল না,
আপনকারা বিচার কর ও জবাব কেন কৈল না।

তারপর আবার ধরিল—

তোকে যেতে বল্লাম দুবরাজপুর, তুই চলে গেলি গুস্করা।
ওগো, তোরা বলে কয়ে মন্দোদরীর হুঁশ করা।

দুবরাজপুর পশ্চিমে গুস্করা দক্ষিণে। কাজেই এবার হাসিটা বিপুল বেগে পড়িয়া গেল।

ওদিকে ফটকে বাজিল নয়টা ঘণ্টা।

সমস্ত ঘরখানা আপনি নীরব হইয়া গেল। কবি গান ভাঙ্গিয়া গেল। সব আপন আপন বিছানায় গিয়া শুইল।

কেষ্ট আপন বিছানায় গিয়া হাঁপায়, আর ছটফট করে। আবার জ্বর, যন্ত্রণা সব আসিয়া বুক চাপিয়া ধরে। জয়ের আনন্দ আর থাকে না।

চৈতন্য আর গণশা পাশাপাশি শুইয়া সকলের নিন্দা করে।

বাহিরে গুমটি হইতে হাঁকে,—এক নম্বর—

এক নম্বর মেট সাইদ গানের সুরে গণনা শুরু করিয়া দেয়,—এক, দুই, তিন, চার—

এক নম্বরে গণনা শেষ হইলে গুমটির জমাদার হাঁকে,—দো নম্বর।

পরের পর, পরের পর গানের সুরে গণনা চলে।

গৌর আসিয়া শুইয়া পড়িল, তার সে ঘোর তখন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে।

মাঝী কহিল,—দাস, আমি তোর বাড়ি—

ওর বুঝি এখন আর ঘুম আসিতে ছিল না।

গৌর বিরক্তিভরে উত্তর করিল,—ভাগ, রাতদুপুরে ব্যার্‌র ব্যার্‌র। সান্ত্রী হাঁকিল,—এক নম্বর—

সাইদ হাঁকিয়া গেল,—এক, দুই, তিন, চার—

আর সব নিস্তব্ধ, যেন মরণ ঘুমে অচেতন।

পাঁচ

জেলের পূর্বধার ঘেঁষিয়া সেলের সারি। ছোট ছোট ঘর, ঘর বলিলে ভুল হয়,—পিঞ্জর, খাঁচা।

হিন্দুস্থানী সিপাই, কয়েদী সকলে এগুলিকে বলে—শের কা পিঁজরা। ওখানে থাকে খুনী, ডাকাত, দুর্দান্ত আসামী সব, যাহাদের বাহিরে রাখা নিরাপদ নয়। ওগুলিরই তিন নম্বর সেলে থাকে, একজন সভ্য বাবুচোর। মোটা টাকা ভাঙ্গিয়া এখন জেলটাকেই বরণ করিয়া লইয়াছে।

ওর ব্যবস্থা সাধারণ কয়েদীর মত নয়, ও বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী। ওর ঘরে খাটের ব্যবস্থা, তাহার উপর তোশক, বালিশ! খাওয়া,—তাও উচ্চ শ্রেণীর, কারণ সাধারণ কয়েদী-জীবনে ও-অভ্যস্ত নয়,—ওর ভাল খাওয়া, ভাল পরা অতীত জীবনে অভ্যাস ছিল।

মানুষটির ধরন অতি অদ্ভুত,—নিজের মত সগর্বে বলিয়া যায়, যুক্তিও বেশ বিচিত্র। সেদিন বিছানায় বসিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে বলিতেছিল,— আমি দুনিয়ায় ভোগ করতে এসেছি, তার জন্য অর্থ আমার প্রয়োজন,—সে আমি যেমন করে হোক উপার্জন করেছি, fair or foul। পাপ! কিসের পাপ? প্রায়শ্চিত্ত করলে পাপ মুছে যায়! সে প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রয়োজন টাকার। টাকা থাকলে সমাজে গো-বধ, ব্রহ্ম-বধ সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যায়; কোর্টে জরিমানা দেওয়া যায়। সমাজের ঘৃণা!—সমাজ আবার কি? সমাজ তো একটা ভোগের জায়গা, বোধ হয় হাট বললেই মানেটা বেশী বোঝা যায়,—একটা মার্কেট। এখানেও সেই টাকাই হল বড় জিনিস। জান, দুনিয়াটা কার বশ? উত্তর ঐ কথাতেই পাবে, খুঁজে নাও। আর সার, সমাজ এই দুনিয়ার মধ্যেই!

তার কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলের মনে যেন একটা শঙ্কা বহিয়া গেল।

ও আরও হাসে আর বলে,—রাগ করো না দাদা! দেখ না, পয়সা ছিল আমার, তাই ভাল খেতে পরতে অভ্যাস করেছিলাম; তার ফলে দেখ জেলে এসেও তাতে বঞ্চিত হইনি। এ সেই পয়সার সম্মান। ছোট লোকের গায়ের গন্ধ সয় না, থাকি আলাদা সেলে; শুয়ে শুয়ে কারাদণ্ড ভোগ করি, ধূম পানে বাধা নাই। কিসের জন্য? ওই টাকা—money, দাদা, money is might, money is right, money is light

ডেপুটি-জেলার দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। রোষে তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, কহিলেন,—জানেন, এতে আমাদের সম্মানহানি হয়?

লোকটি তেমনি হাসিয়া উত্তর দিল,—আজকাল সম্মানহানির প্রতিকার কি জানেন তো—মানহানির নালিশ। আর মানহানিরও বিনিময় হয় টাকায়। অবশ্য আমি তার জন্য মানুষকে দোষ দিই না; বরং তাদের বুদ্ধি অনেক উন্নত হয়েছে মনে করি। তারা যে আগের মত মানের জন্য প্রাণ পণ করে বসে না, তার জন্য Congratulate করি তাদের।

ডেপুটিবাবুর মাথায় এর উত্তর যোগাইল না, হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা আসি। *পাঁচ নম্বরে সেই সত্যাগ্রহী ছেলেটি আবার 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' করে বসে আছে।* বলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন।

বাবুটি একটি সিগারেট বাড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কেন?

ডেপুটিবাবু হাত পা নাড়িয়া যতদূর নিরাশা প্রকাশ করিতে পারা যায়, করিয়া বলিলেন,—আর বলেন কেন মশায়! সত্যি বলেন আপনি, সব fool-এর দল। কবে কোন্ সেপাই কোন্ বুড়ো কয়েদীকে পেটে মেরেছে, কাদের খাবার ভাল হয় না—যত সব পরের জন্যে

ওদের মাথা ব্যথা, আর আমাদের মরণ। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

বড় লোহার গেট যখন খোলে, মনে হয় একটা বিশাল দৈত্য হাঁ করে। তারই মাঝে শক্তির টানে প্রবেশ করে অপরাধীর দল। সেদিন আসিল একটা লোক—রুক্ষ শীর্ণ মূর্তি, লম্বা লম্বা পিঙ্গল চুলগুলি জটা বাঁধিয়া গেছে। ধূলি-ধূসরিত দেহ, তাম্রাভ রং, কোটরগত ছোট ছোট চোখ—তাহাতে পিঙ্গল তারা অস্থির ভাবে ঘুরিতেছে, দৃষ্টি অর্থশূন্য, কিন্তু যেন ভয়ার্ত। চারিদিকের সকল ছবিই যেন তাহার কাছে বিভীষণ ত্রাস-সঞ্চারী।

হাতে তার হাতকড়ি, কোমরে দড়ি, কপাল-জোড়া মস্ত একটা সদ্য-ক্ষতচিহ্ন,—সর্বাঙ্গে প্রহারের দাগ,—সোটা কাল কাল দাগগুলিতে অবরুদ্ধ রক্তধারা ভিতরে জমাট বাঁধিয়া গেছে।

পুলিসের দারোগা স্বয়ং জেলের আফিসে আসামীকে জমা দিতে লইয়া আসিয়াছে।

আহত আসামীটা গেটের রাস্তাতেই অবসন্ন ভাবে শুইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ দুইটা নিমীলিত হইয়া আসিল,—সমস্ত চৈতন্যশক্তি যেন তাহার নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়া গেছে।

দারোগা জেলারকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিল,—সাবধান, লোকটা কিন্তু বড় ভায়লেণ্ট।

জেলার জিজ্ঞাসা করিল,—কেসটা কি ?

খুন।

—ডাকাতি করতে গিয়ে খুন নাকি ?

—না। লোকটা ছিল একঘরে। গ্রামের কারুকে মানত না, তাই গাঁয়ের লোক ওকে একঘরে করে। বেটা করলে কি, রাত্তিরে লাগাতে

লাগল আগুন। নালিশ হল, ওয়ারেণ্ট বেরুল। ও হল ফেরার। ফেরার মানে নিরুদ্দেশ নয়—আজ এ-গ্রাম, কাল ও-গ্রাম এমনি আর কি। মোট কথা ধরতে পারা যায় না। শেষ যেদিন, মানে দিন পাঁচেক আগে, আবার ও গ্রামে দিলে বেড়া-আগুন। সমস্ত গ্রাম পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। সেদিন গ্রামের সকল লোক ওর পেছনে করলে তাড়া; তিন দিন পেছনে লেগে লেগে ক'জনে ওকে এক জায়গায় ধরে ফেলে, কিন্তু, তাদের মেরে ও আবার পালাল। ওই দেখছেন চিমড়ে চেহারা, কিন্তু দেহে সাংঘাতিক ক্ষমতা মশাই। তার ওপর জাত কামার, লোহা-পেটা হাত। বাগিয়ে ধরতে পারলে পিষে মেরে দেবে। হ্যাঁ,—সেখান থেকে পালিয়ে ও পাশের গ্রামের একখানা পড়ো-বাড়িতে গিয়ে ঢুকে পড়ে। বাড়িখানা কোঠাবাড়ি। সেই কোঠার ওপরে গিয়ে লুকোয়। গ্রামের লোক ধরতে গেল; ওর হাতে ছিল একখানা শাবল, সেই শাবলের ঘায়ে সামনের লোকটার মাথা একেবারে চুর করে দেয়। অথচ সে লোকটাও ছিল এরই বন্ধু, বদমাইশিতে দোসর—

জেলার শিহরিয়া কহিল,—Horrible!

দারোগা বলিয়া চলিল,—বীভৎস দৃশ্য সে মশাই। লোকটার মুখ চোখ ঘিলু রক্ত—উঃ, শরীর শিউরে উঠছে। লোকটাকে আর চেনবার উপায় নেই। আর সে লোকটা কি জোয়ানই ছিল! খুন হতেই গ্রামের সব লোক দে ছুট! তার পর আবার ও সেখান থেকে পালায়। শেষ সেখান থেকে আমরা তাড়া করে, তিন ক্রোশ দূরে আর একটা গ্রামে, মেরে ঘায়েল করে তবে ওকে ধরি। দেখুন না, কপালের ক্ষতটা আর—পিঠে মারের দাগ। তা-ও ভাগ্যিস্ তখন ওর হাতে কিছু ছিল না। আর খুন করে কতকটা অজ্ঞানের মতই হয়েছিল। হ্যাঁ, মারের ব্যাপারটা দেখবেন যেন টিকিটে—

জেলার জেল-টিকিটে ওর বিষয় লিখিতে লিখিতে একটু হাসিয়া

কহিলেন,—আচ্ছা, টিকিট লেখা শেষই হোক না; তার পর কি লিখলাম দেখবেন।

দারোগা জেলারের দিকে একটা সিগারেট বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—নিন একটা সিগারেট খান।

কাজ শেষ করিয়া দারোগা চলিয়া গেল। একজন সান্ত্রী আসিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন আসামীটাকে একটা রূঢ় ঝাঁকানি দিয়া টানিয়া তুলিল।

ভয়ার্ত চিৎকার করিয়া লোকটা উঠিয়া বসিল। বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইয়া যেন সে দেখিতেছিল—কি এটা।

চারিদিকে অবরুদ্ধ প্রাচীর। লোহার ফটকের মাঝখানে সিক দেওয়া একটা খিলানের মধ্য দিয়া খানিকটা আলো আসে বটে, কিন্তু এতখানি অন্ধকারের মধ্যে সে কতটুকুই বা! তা-ও যেন ম্লান, ভীত সন্ত্রস্ত! ওই ম্লান আলোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেট-ওয়ার্ডার। মাথায় তাহার পাগড়ি, গায়ে খাকী উর্দি, বুকে পৈতার মত ঝুলান মোটা শিকল-বাঁধা চাবির থলে।

লোকটা আতঙ্কে ভয়ার্ত বন্য-পশুর মত দেহটা কুণ্ডলী পাকাইয়া বুকে হাঁটিয়া সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। গেট-ওয়ার্ডার গেটের তালায় চাবি ঘুরাইয়া ফটক খুলিয়া দিল।

ভিতরের ফটকটা খুলিতেই আলোক সম্পাতে রক্তবর্ণ দরজাটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আসামীর চোখ দুইটা আরও বিস্ফারিত হইয়া গেল।

জেলার বলিয়া দিল,—চার নম্বর ডিগ্রী।

একজন সিপাহী ওকে টানিয়া তুলিয়া কহিল,—আ-য়ো।

লোকটা চলিল, পার হইবার সময় ফটকটার গায়ে একবার সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া, চোখের সম্মুখে মেলিয়া অতি নিবিষ্ট চিত্তে দেখিল। তারপর নাকের কাছে লইয়া শুঁকিল। তাহাতেও যেন সে কিছু স্থির করিতে পারিল না।

আবার ঘন ঘন হাতটা মুঠি বাঁধিয়া ও খুলিয়া দেখিতে লাগিল। হাতটা যেন তাহার চটচট করিতেছে—আঠার মত।

সহসা ওর বিকৃত মুখ হইয়া উঠিল আরও বিকৃত, পাংশু, বিবর্ণ। সমস্ত দেহটা তাহার ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বিস্ফারিত দৃষ্টি তখনও পিছনের ওই রক্তবর্ণ দরজাটার দিকেই নিবদ্ধ।

জমাদার এবার ধমক দিয়া হাঁকিল,—আরে আ-য়ো—

লোকটা চমকিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সে যেন স্বপ্নে চলা। পথে দুই তিনবার ঠোক্কর খাইল। রাঙা কাঁকরের পথ ছাড়িয়া কে জানে কেন সে পাশের ঘাসের উপর দিয়া চলিতেছিল, সহসা বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা, ওটা কি ফাঁসির আসামীর রক্ত ?

খুনী আসামীর ভয়ার্ত বিস্ময়ে সিপাহী আশ্চর্য হইল না। খুনীদের এমন হয়। সে তাহাকে তাড়া দিয়া আদেশের টানে টানিয়া লইয়া চলিল।

এই বিশাল প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে চারিদিকে যেন মরণের এক কল্পিত ছবি মরীচিকার মত কল্পিত ভয়ংকর হাসি হাসিতেছিল। চলিতে চলিতে শাসনের ত্রাস ভুলিয়া গিয়া বিহ্বল ভাবে আবার সে জিজ্ঞাসা করিল,—ওই যে ফটকের গায়ে মাখান রক্ত, টকটকে লাল—

দয়া, স্নেহ, মায়া যেমন মানুষের একটা দিক, তেমনি নির্মমতা, নৃশংসতাও মানুষেরই আর এক দিক। শৈশব হইতেই সে প্রবৃত্তি মানুষ আপন বুকে পুষ্ট করিয়া তোলে। শিশু ফুল দেখিয়াও হাসে, আবার কীটকে কোমল হাতে দলিয়া মারিয়াও তাহার কম আনন্দ হয় না ; তাই মানুষ অভ্যাসের বশে পশু, পাখি, মাছ, শিকারের বস্তু করিয়া লইয়াছে। এটা তাহার খেলা। ইহাতেই তাহার আনন্দ। অভ্যাসের বশে কয়েদীকে শাসন করিয়া সিপাহীর কিছুমাত্র শোচনা হয় না, মানুষ মারিয়া সৈনিকের বুকে বাজে না। মানুষের বুক বিঁধিয়া বিজয়ী সৈনিক বাড়ি ফেরে সহজ আনন্দেই এবং আর একটি

মানুষকে—হয়তো বা সে নারী—হয়তো বা সে শিশু—বুকে জড়াইয়া ধরে। এতটুকু বাধে না।

এর জন্যে সব চেয়ে বেশী দায়ী বোধ হয় সে-ই, যে দাগ টানিয়া টানিয়া এক মানুষের মাঝে শত জাতি, সহস্র শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে, শত লক্ষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছে।

বিহ্বলের ওই মৃত্যু-কাতরতা-ভরা প্রশ্নে তাই ওই সিপাহীটার মনে বিন্দুমাত্র দাগ পড়িল না। তাহার প্রশ্নের উত্তরে সে অতি স্বচ্ছন্দে একটা নির্মম ঝাকানি দিয়া কহিল,—কেয়া পাগলা বনতা হ্যায়—না কেয়া ?

আসামীটা ঝাকানিতে সচেতন হইয়া কহিল,—আজ্ঞে না, পাগল হইনি তো।

—তব, কেয়া বলছে তু ?

—এটা তো জেলখানা ?

পাশেই একটা কয়েদী বসিয়া ঘাস পরিষ্কার করিতেছিল, সে মুচকি হাসিয়া উত্তর করিল,—না, এটা তোর শ্বশুরবাড়ি ! ন্যাকা রে !

লোকটা বিহ্বল দৃষ্টিতে শুধু তাহার পানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

কাপড়ের ঘর হইতে তাহার মিলল দু'খানা কম্বল : গুদাম হইতে পাইল একখানা থালা, একটা বাটি।

সেখান হইতে তাহাকে লইয়া চলিল চার নম্বর সেলে।

পথে একটা পুরানো কয়েদী একে ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিসের মামলা ?

পাগল হয়তো সে কথাটা শুনতেই পাইল না। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, ওই যে ফটকের গায়ে লাল টকটকে রং—ও রক্ত নয় ? ফাঁসির আসামীর রক্ত বুঝি ?

কয়েদীটা বিস্মিতভাবে তাহার মুখ-পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —খুন করেছিস ?

সে পাংশুমুখে অতি ত্রস্ত হাত নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল,—না, না, খুন তো করি নাই—

ধমক দিয়া ওয়ার্ডার হাঁকিল,—এই—আ-য়ো, মারে থাপ্পড় !

পুরানো আসামীটা সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া পড়িল। এ লোকটা ত্রস্ত-পদে সিপাহীর অনুসরণ করিতে করিতে কহিল,—মনে নেই, আমার তো মনে নেই, মা কালীর দিব্বি, আমার মনে নেই। তখন—

ওয়ার্ডার আবার ধমক দিল বিরক্তিভরে—আরে !—

—আজ্ঞে, আমাকে চার দিন কুকুরের মত তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে। চার দিন কিছু খাইনি হুজুর,—চার দিন ঘুমোইনি।

সম্মুখে আসিয়া পড়িল এক নম্বর ডিগ্রী,—সেল।

সেলের প্রথমেই একটা অ্যান্টিসেল, তারপর সেল। অ্যান্টিসেল-গুলি ঘরের বারান্দার মত। কিন্তু সেগুলিরও চারিদিক ঘেরা,—শুধু মাথার উপরটুকু খোলা।

অ্যান্টিসেলের দরজাটা খোলা ছিল। ভিতরে লোহার গরাদে ঘেরা দরজা. তা-ও খোলা। ভিতরের কয়েদীটাকে একটু আলো বাতাস ভোগ করিবার অবসর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কয়েদীটার সে তৃষ্ণা যেন নাই। আপন বিছানার উপরে সে লম্বা হইয়া পড়িয়াই ছিল। লোকটা 'লালটুপি'।

ডাকাতি ও ব্যভিচারের অপরাধে উহার বারো বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। কিন্তু দুর্দান্ত লোকটা জেলের মধ্যে থাকিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই ; প্রথম বৎসরই একদিন সে জেল হইতে পলাইবার চেষ্টা করে। তারপর ধরা পড়িয়া মেয়াদ আরও বছর দুয়েক বাড়িয়া গেছে। তাই ওকে চিহ্নিত করিতে মাথায় উঠিয়াছে লাল টুপি, বাস হইয়াছে পিঞ্জরে—ওই সেলে।

লোকটা শুইয়া শুইয়া আপন মনে গান করিতেছিল—

'লাল গামছা ডুরে শাড়ি কিনতে হবে হাটে,
বউটি আমার দাঁড়িয়ে আছে গাঁয়ের ধারে মাঠে।'

ছায়া-নিবিড় গ্রামপ্রান্তে পদচিহ্ন-আঁকা শীর্ণ একটি পথরেখার পাশে কোন্ প্রতীক্ষমাণা তরুণীর সতৃষ্ণ-নয়নের ছবিটিই বুঝি আজ হতভাগ্যের নিঃসঙ্গ নিঃস্ব-জীবনের একমাত্র সম্বল। তাই বারবার সে ওই গানটিই গায়। ওর বুকের ভিতরের কোমল মানুষটি ওই ছবিটির ছায়াতেই অতি কষ্টে বাঁচিয়া আছে। এত বড় বুকের আর সবখানা দখল করিয়া আছে নির্মম, নৃশংস-মানুষ।

বাহিরের সদ্য-আগত ধূলিধূসরিত ওই বিহ্বল মানুষটিকে দেখিয়া অকস্মাৎ তার ভিতরের কঠোর মানুষটি যেন কৌতুকভরে জাগিয়া উঠিল। গান ছাড়িয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—আরে, এ কে এল ?

খুনী আসামীটি তাহার দিকে তেমনি বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়াই রহিল। 'লালটুপি' আবার জিজ্ঞাসা করিল,—ডাকাতি, না খুন ? কি সাঙ্গাত কথা কইচ না যে ?

ওয়ার্ডার 'লালটুপি'কে একটা ধমক দিয়া কহিল,—চুপ রহো।

'লালটুপি' ধমকে ভয় পাইল না, ব্যঙ্গ করিয়া দাঁত মেলিয়া হাসিয়া উঠিল।

খুনী আসামীটা ধমক শুনিয়া ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিল,—কিছুই তো মনে নেই ! মা কালীর দিব্যি—

'লালটুপি' এবার উচ্চরোলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল,—সাঙ্গাত বড় সেয়ানা। হোঃ-হোঃ-হোঃ—

এদিকে তাহারা দু'জন আসিয়া পড়িল দু'নম্বর সেলের সম্মুখে। তখনও 'লালটুপি'র নির্মম হাসিটা শোনা যাইতেছিল।

দু'নম্বরে একটা খিটখিটে রোগা লোক ঊর্ধ্ববাহু হইয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। উপরে দেওয়ালে-আবদ্ধ হাতকড়িতে তার হাত দুইটা আটকান। জেলের আইন ভঙ্গ করার অপরাধে 'স্ট্যাণ্ডিং হ্যাণ্ডকাফ'—খাড়া হাতকড়ি সাজা দেওয়া হইয়াছে।

লোকটার চোখ দুইটা যেন ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, বুকের প্রকট পঞ্জরগুলো অবশ পদের শিথিলতায় নীচের মাটির টানে ও উপরের হাতকড়ির টানে হাপরের মত প্রতি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে দুলিতেছে ; মনে হয় এখনি ফাটিয়া যাইবে বুঝি।

ছবিটা দেখিয়া মনে হয়, জননীর বক্ষ হইতে যেন সন্তান কাড়িয়া লইতে চায় কোন বিজয়ী সৈনিক। নীচে বুক পাতিয়া টানে অনন্ত বাৎসল্যময়ী ধরিত্রী-জননী, আর উপরে টানে শক্তির লৌহ-শৃঙ্খল।

ওর ছবি দেখিয়া নতুন আসামীটা ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। ওর মনে হইল, লোকটা বুঝি ফাঁসি কাঠে ঝুলিতেছে।

ওয়ার্ডারটির আর সহ্য হইল না। কোমরের পেটি ওর পিঠে সজোরে চালাইয়া শাসন করিয়া দিল।

তখনও চোখের সম্মুখে বোধ করি সে সেই ছবিই দেখিতেছিল ; অতি আতঙ্কে স্থানকাল হারাইয়া সে ছুটিয়া পলাইতে চাহিল।

সিপাহী তাহার চুলের মুঠিতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল তিন নম্বর সেলের সম্মুখ দিয়া।

তিন নম্বরে থাকে সেই বাবু চোরটি।

লোকটা তখনও অতি-আতঙ্কে তেমনি চিৎকার করিতেছিল। চিৎকারে বাবুটি বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করিল,—কে ?

একটু সম্ভ্রমের সহিতই সিপাহী জবাব দিল,—খুনী আসামী, বহুত বদমাশ! ভাগনেকো মতলব।

বাবুটি হাসিয়া কহিলেন,—ভয় নেহি দাদা, ছোড় দেও। জেল-খানাকে পাঁচিল নিদ্ নেহি যাতা, হরদম খাড়া হ্যায়। ভাগেগা কাঁহা?

সিপাহী রহস্যটা বুঝিয়া হাসিয়া ছাড়িয়া দিল। আসামীটা এতটুকু করুণা পাইয়াই আরও করুণার আশায় বাবুটির সেলটাতেই গিয়া ঢুকিয়া পড়িল। সিপাহীটা আবার তাহাকে ধরিতে যাইতেছিল, বাবুটি ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া হাতের সিগারেটটি আসামীটার দিকে ছুড়িয়া দিয়া কহিল,—নে, খা!

সিপাহী কহিল,—নেহি বাবু, এইস্যা রুল—

বাবুটি হাসিয়া কহিল,—আরে যানে দেও ভেইয়া! নে-নে, নে বেটা টেনে নে, গলায় রস হবে।

সিপাহীকে কহিল,—মিঠাই লে খাইও সিপাহীজী!

সভয়ে বাবুটির মুখ পানে তাকাইতে তাকাইতে সন্তর্পণে আসামীটা আধপোড়া সিগারেটটায় দুইটা টান দিল। শঙ্কিত দৃষ্টি, সর্বাঙ্গ তাহার কাঁপিতেছিল। একটা নির্যাতনের ভয়ে সর্বদাই সে যেন অস্থির।

বাবুটি জিজ্ঞাসা করিল,—কাকে খুন করেছ? বেটা বুঝি কৃপণ, বড়লোক ছিল? কত টাকা পেলে?

—দারোগা বাবু!—

বাবুটি হাসিয়া বলিল,—আমিও চোর, দারোগা নই!

কথাটা যেন তাহার বিশ্বাস হইল না। পরম বিস্ময়ভরে নিজের মনেই কহিল,—চোর! চোর খাটে শোয়?

কথা শুনিয়া বাবুটি হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ওই বিহ্বল, বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি তাহার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। তাহার মনেও যেন ওর ওই দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতই একটি ব্যথিত আন্তরিকতা জাগিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাহার সহজাত লজ্জার সংস্কার মুহূর্তে খাড়া হইয়া

আপন অস্তিত্বের সাড়া জানাইয়া দিল। বাবুটি মুখ কালো করিয়া ধমক দিয়া কহিল,—ভাগ্, ভাগ্ বেটা খুনী!

সিপাহীটা তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। কাতর ভাবে লোকটি বাবুটির মুখ পানে চাহিয়া কহিল,—বাবু!

বাবু কহিল,—ভাগ্!

বলিয়া সে নিজেও উপুড় হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

এরা আসিয়া পড়িল চার নম্বরে।

পাঁচ নম্বর সেলে নরু কম্বলের উপর শুইয়াছিল। সে অনশনব্রত লইয়া আহার পরিত্যাগ করিয়াছে। ডেপুটি জেলার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সাধ্যসাধনা করিয়া গেছেন। সে আহার গ্রহণ করে নাই।

একটা সিপাহী আপন বুদ্ধিমত সরল সত্য তাহাকে বুঝাইয়া গেছে,—ইসমে কেয়া ফায়দা বাবু! জান যায়েগা আপকা, দুনিয়া য্যায়সা চলতা রহা ঐসি মজেমে চলতে রহেগা।

নরু শুইয়া শুইয়া আপন মনে সেই কথাটাই ভাবিতেছিল। এত জনের এত কথার মধ্যে তাহার এই কথাটাই ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। রুদ্র দেবতার মরণ-খেলায় প্রতি মুহূর্তে লক্ষ কোটি জীবের অস্তিত্ব মমতাময়ী সুন্দরী ধরণীর বুক হইতে মুছিয়া যাইতেছে। কে কাহার খোঁজ রাখে? এই মুহূর্তের শোকাশ্রু পর মুহূর্তের হাসির উচ্ছ্বাসে ডুবিয়া যায়।

ভাবিতে ভাবিতে নরু সহসা আপন মনেই হাসিয়া উঠিয়া বসিল।

হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল,—পিপীলিকার একটা সারি! তাহারই অভুক্ত আহার্যের কয়টা কণা মেঝের উপর পড়িয়াছিল, তাই লইয়া তাহারা মহাব্যস্ত। আবার এই আহার্যের কণা লইয়াই তাহাদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধও বাধিয়া যাইতেছে। সারিটা চলিয়া গিয়াছে ওই দেওয়ালের

মাথা পর্যন্ত। সেখানে আবার আর এক কৌতুক! একটা টিকটিকি ছাদ হইতে মধ্যে মধ্যে লাফ দিয়া আসিয়া উহাদের ধরিয়া ধরিয়া খাইতেছে। বহুক্ষণ একদৃষ্টে নরু এই কৌতুক দেখিল।

ও-ঘরের খুনী-আসামীটার মুহুর্মুহু আর্তচিৎকার তখনও ভাসিয়া আসিতেছে।

তিন নম্বরের বাবুটির গলাও শুনা গেল; অত্যন্ত বিরক্তিভরে কহিতেছে,—আজই ওকে ফাঁসি দেওয়া উচিত!

আবার সহসা উচ্চকণ্ঠে ধমক দিয়া উঠিল,—Shut up you scoundrel!

ছাদ হইতে খসিয়া-পড়া পলেস্তারার একটা টুকরা দিয়া নরু মেঝের উপর দাগ দিতে দিতে লিখিতে লাগিল—

"মানুষের ভয়,—
সেতো কভু মরণকে নয়!
দুর্ভেদ্য তমসা-মাখা আবরণ তার
ভয় সেই; ভয় শুধু তারে অজানার।"

বাহিরে তালা বন্ধ করার শব্দ হইল। দিনের আলো বাহিরে ম্লান হইয়া আসিয়াছে। সেলের ভিতরে অন্ধকার ধীরে ধীরে আসন পাতিয়া বসিতেছে। নরুর সেদিকে দৃষ্টি নাই। সে আপন মনেই লিখিয়া চলিয়াছে,—

"কে,—কে,—কে দিবে সে রূপ পরিচয়,
মানুষেরে করিতে নির্ভয়?"—

ছয়

খুনী আসামীটা সেলের এক কোণে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়াছিল—

স্বল্প-আলোকিত নির্জন সেলটার ভিতর একটা নিরাপদ আশ্রয় পাইয়াছে মনে করিয়া সে যেন বেশ একটু নিশ্চিন্ত বোধ করিল। কিন্তু দিনান্তের যে স্তিমিতপ্রায় আভাটুকু ঘরের অন্ধকাররাশিকে ঈষৎ স্বচ্ছ করিয়া রাখিয়াছিল, সেটুকুও ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতে শুরু করিল। মৃত্যু যেমন জীবের দেহে রুদ্র-রূপের কালো ছায়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে জীবনকে তার নিঃশেষে গ্রাস করিয়া ফেলে—চারিদিক হইতে তেমনি একটা তরল অন্ধকারের স্রোত ক্ষণে ক্ষণে ওই আলোকাভাটুকুকে গ্রাস করিবার জন্য সন্তর্পণে আগাইয়া আসিতে লাগিল।

বাহিরে সেলের পর সেলে তালা বন্ধ হইতে লাগিল। তালা চাবির খটাখট শব্দ, লৌহ-শৃঙ্খলের ঝনঝনা ওকে যেন স্থান কাল, বর্তমান ভবিষ্যৎ, সব স্মরণ করাইয়া দিল ; ওর মনে পড়িয়া গেল এটা জেলখানা, সম্মুখে ওর—ফাঁসি, মৃত্যু।

সে বুক চাপড়াইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল,—হায় হায়, আমি এ কি করলাম গো! এ আম কি করলাম!

সহসা ওর সেলের দরজায়ও শব্দ হইল ; ওর করুণ আক্ষেপও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। কোনও আশায় নয়—একটা নির্যাতনের আশঙ্কায়।

সেলের দরজাটা খুলিয়া প্রবেশ করিল কয়েদী পাচক, আর তার পিছনে আলো লইয়া প্রহরী।

—থালা পাত—থালা। ভাত নে—

আসামীটা পাচকের পানে বিমূঢ়ভাবে তাকাইয়া রহিল, সে তাহার কথা কিছু বুঝিতেই পারে নাই যেন।

সঙ্গের সিপাহীটা ধমক দিল,—এই, থালি নিকালো !

থালাটা সম্মুখে পড়িয়া, অথচ লোকটা বিহ্বলের মত চারিপাশে খুঁজিতে লাগিল। ওর মনের মধ্যে হয়তো থালার ছবি জাগিতেছিল না, জাগিতেছিল ওই যমদূতাকৃতি সিপাহীর নির্মম মূর্তিটা।

সিপাহীটা অগত্যা কয়েদী পাচকটিকেই বলিল,—দেও, দেও, তুম্‌হি থালাটো লিয়ে দিয়ে দেও।

খাবার দিয়া পাচক ও সিপাহী চলিয়া গেল। বাহিরে তালা চাবি শিকলের ঝনঝন শব্দ ভিতরের বন্দীটিকে আবার শঙ্কাতুর করিয়া তুলিল। সন্তপিত দৃষ্টিতে ওই শব্দ লক্ষ্যে সম্মুখের বন্ধ দ্বারের অন্ধকার পানে চাহিয়া আসামীটা ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল রাখিয়া-যাওয়া সম্মুখের ওই থালাটার উপর।

অস্থির চক্ষে তাহার একটা বিচিত্র দৃষ্টি খেলিয়া গেল। ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া সে থালাটা টানিয়া আনিল আপন বুকের তলায়। তার পর অতি ভীরু লোলুপ-বুভুক্ষায় ঘন ঘন গ্রাসে সমস্তটাই যেন ও একনিঃশ্বাসে শেষ করিয়া ফেলিতে চাহিল। শ্মশানচারী শৃগাল যেমন অপরের লুব্ধ দৃষ্টি বাঁচাইয়া সগুলব্ধ শবদেহটাকে গ্রাসের পর গ্রাসে নিঃশেষে উদরস্থ করিয়া ফেলিতে চায়, ঠিক তেমনি ওর ভীরুতা, তেমনি লোলুপতা, তেমনি ব্যগ্রতা। সে গ্রাস করিতে চায় কিন্তু গিলিতে পারে না ; রসনা রসহীন, লালাহীন জিহ্বাগ্র হইতে সমস্ত বুকটা যেন শুষ্ক মরুভূমি,—হু হু করিতেছে। ভুক্ত আহার্য সমস্তটা উগারিয়া ফেলিয়া দিয়া, বাটির জলটা ঢকঢক করিয়া নিঃশেষে পান করিয়া ও মাটির বুকের উপর এলাইয়া পড়িল। উদ্গীরীত উচ্ছিষ্ট গায়ে, হাতে, সর্বাঙ্গে লাগিয়া গেল ; সেদিকে দৃষ্টি নাই, হাত মুখ পর্যন্ত ধুইবার খেয়াল নাই—বুঝি শক্তিও নাই।

ক্লান্তি—ক্লান্তি, দারুণ অবসাদ !

দেখিতে দেখিতে বিশ্বরাজ্যের ঘুম আসিয়া যেন ওকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

—ওঠো, ওঠো, ওগো, শীগগির ওঠো—

ও তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখে,—ভয়ত্রস্তা বাসিনী।

হাঁা, সেই তো ! সেই কালো পাথরে খোদা সেই সুন্দর রূপ, সেই বড় বড় চোখ, নাকে সেই তারই দেওয়া ওপেলের নাক-ছাবিটি, কানে লাল পাথরের সেই দুটি টিপ ! সেই চলকো লালপেড়ে শাড়ি, সেই পানের রঙে রাঙা ঠোঁট ! বাসিনীই তো !

ও বাসীনীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বাসিনী, কেউ দেখেনি তো ? তোর বাবা, দাদা—

বাসিনী অতি ত্রস্তভাবে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—না, আজ আমাদের বাগদী-পাড়ায় ভাসান গান হচ্ছে। তুমি বেরিয়ে এস শীগগির।

—কেন ?

—ঘরে শেকল দিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারবে তোমাকে।

—কে ?

—আবার কে ? সে মুখপোড়া রাখাল মজুমদার। আজ সেই আমাদের পাড়ায় ভাসান গানের পয়সা দিয়েছে। আমাদের বাড়ির পেছনে দু'দলে বসে সব পরামর্শ করছে, আমি শুনে এলাম। আর একটু বাদে তোমার ঘরে আগুন দেবে, আর আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

বাসিনী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নিজের বুকে বাসিনীর মুখখানি আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল,—কার সাধ্যি ? কালি কামার বেঁচে থাকতে কোন শালার সে সাধ্যি নেই। বোস্ তুই এখানে।

—মা-মা, তুমি বেরিয়ে এস, ওরা শেকল দিয়ে ঘরে আগুন দেবে।

একটা বিপুল সাহসের মৃদু হাসি হাসিয়া কালি কহিল,—আচ্ছা চল।

তখনও তারা বেশী দূর যায় নাই। বাসিনী পিছন ফিরিয়া সহসা আতঙ্কে চিৎকার করিয়া উঠিল,—ওই দেখ, আগুন দিয়েছে—

কালি ফিরিয়া দেখিল, হ্যাঁ আগুন! তাহারই ঘরখানা জ্বলিতেছে।

ভয়ে ভয়ে বাসিনী বলিল,—ওগো, আমি যাই, এখুনি লোক জমবে!

আর একবার আগুনটার পানে চাহিয়া ও বলিল,—আচ্ছা যা, সাবধানে থাকিস।

বাসিনী চলিয়া গেল।

কালি নিজের প্রজ্বলিত বাড়িটার দিকেই আগাইয়া চলিল।

ওই যে, ওরই ঘরের আগুনে সমস্ত গ্রামখানা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে,—ওই যে শূন্য-পথ বহুদূর আলোয় আলোময় হইয়া গিয়াছে, উপরে আকাশ নিবিড় কালো; নীচের অন্ধকার আলোর ভয়ে উপরে গিয়া জমাট বাঁধিয়াছে।

ওই—কোলাহল!

হাঃ হাঃ হাঃ, চমৎকার,—পোড়াও, কালি কামারকে পুড়িয়ে মার! কেমন, তোমাদের দেওয়া আগুন তোমাদের বুকে কেমন ছড়িয়ে দিয়ে এসেছি!

জল, জল, জল।

হাঃ হাঃ, জল শুকিয়ে গিয়েছে; তোদের অধর্মে পাপে বোশেখের সূয্যি জল শুষে নিয়েছে! কাঁদ, কাঁদ, চোখের জলে নেভে তো দেখ।

ওই, ওই, রাখাল মজুমদারের ঘর জ্বলছে,—ওই উঁচু তেতলা ঘর। ওঃ আগুনটা যেন আকাশ ছোঁয় ছোঁয়! কি লাল! পাকা পাকা শাল কাঠ, রং দেওয়া দরজা,—শুধু কি তাই, কত গরিবের বুকের রক্ত—লাল হবে না! নিবি শালা বুড়ো যখ, বাসিনীকে কেড়ে নিবি?—বামুন হয়ে বাগদীর মেয়ের উপর লোভ! খুব খাও বাবা ব্রহ্মদেব, খুব খাও।

—ও কি? আগুনের আলোয় দেখা যায় নড়ে চড়ে—ও কি? মানুষ? হ্যাঁ মানুষই তো! গ্রাম ছেড়ে পালায় বুঝি!—

তাই, তাই ঠিক। আগুনের আঁচ সওয়া কি সোজা কথা! পাকা পাকা শাল-কাঠ পুড়ছে, রং পুড়ছে, কাঁসা—ভাল ভাল খাগড়াই বাসন গলে টলটল করছে, লোহা গলছে, বারান্দার রেলিং, লোহার সিন্দুক, তার ভেতরে টাকার কাঁড়ি, সোনার গয়না গলছে, গলে টগবগ করে ফুটছে; সে কি সোজা আঁচ! খানিকটা লোহার আঁচেই কালি কামারের বুকটা সদাই তপ্ত ঝাঁ ঝাঁ করে, বুকের রোঁয়াগুলো পুড়ে যায়,—আর, এ বাবা রাশি রাশি লোহা, পেতল, কাঁসা, তামা, রুপা. সোনা!

কেমন, যাও রাখাল মজুমদারের তাবেদারী করগে যাও,—কালি কামারকে একঘরে কর, তার ঘরে আগুন দাও. দাও! হাঃ হাঃ—

ওকি? ওরা যে এ দিকেই আসে! ধরতে আসে না-কি?

হ্যাঁ, ওই যে শোনা যায়—'ওই—ওই শালা কামার, ধর, পোড়াব শালাকে আজ; ওই জ্বলন্ত ঘরে হাত পা বেঁধে ফেলে দেব! ধর—ধর'—

ওই যে লোকগুলা সত্যই ছুটিয়া আসিতেছে।

লোহার মত বুকখানাও ওর কাঁপিয়া উঠিল, অসম্ভব দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল; ও নিজেও যেন সে শব্দ শুনিতে পাইতেছিল। বেচারা পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু যেন পায়ে পায়ে বাধিয়া যায়; ছুটিতে পারিল না।

উদ্বেগে আশঙ্কায় ওর বুকটা আরও দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিন্তু আর দ্রুত চলিবার শক্তিও বুঝি সে যন্ত্রটার নাই, এইবার বুঝি একেবারে থামিয়া যাইবে!

সহসা তন্দ্রা টুটিয়া গেল, ও উঠিয়া বসিল, সর্বাঙ্গ ওর স্বেদাপ্লুত হইয়া গেছে, আকণ্ঠ তৃষ্ণা! উঃ—জল, জল, জল!

অন্ধকারে বুকে হাঁটিয়া লোকটা মেঝেটা হাতড়াইয়া ফিরিতে লাগিল, জলের বাটিটা হাতে লাগিয়া উলটাইয়া গেল, সামান্য যে জলটুকু ছিল সেইটুকুও মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িল।

ওর হাত পড়িল ওই স্বল্প সিক্ততাটুকুর উপর—আঃ, জল, এই যে জল!

পশুর মত মেঝের জলটুকু ও জিভ দিয়া চাটিয়া খাইতে শুরু করিল।

কতটুকু, কতটুকু,—আর নাই, আর নাই যে!

হতাশ ভাবে ওই সিক্ততা টুকুর উপরেই ও শুইয়া পড়িল।

আঃ, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা! জুড়াইয়া গেল, আগুনের আঁচে ঝলসানো দেহখানা ওর যেন জুড়াইয়া গেল!

আঃ, বাঁচিয়াছে সে, এমন ঠাণ্ডা জায়গা, আর এমন গোপন স্থান! —অন্ধকার, নিজেকেই নিজে ও দেখিতে পাইতেছে না, এখান হইতে কে খুঁজিয়া বাহির করিবে!—খোঁজ, খোঁজ, খুব খোঁজ শালারা—

বাহিরে ফটকের ঘণ্টায় বারোটা ঘা পড়ে—

এ সময় পাহারা বদল হয়,—অনেক ক'টি তৎপর পদের বুটের আওয়াজে বাঁধান ফালি-রাস্তাটা মুখর হইয়া উঠে, দরজার তালাগুলি ঘটাঘট শব্দে টানিয়া দেখা হয়। ভিতরের স্তব্ধ অন্ধকার ওই কঠিন শব্দধ্বনিতে যেন শিহরিয়া উঠে; বন্দিশালার ভিতরের বন্দীগুলার মতই যেন তাহারও তন্দ্রা টুটিয়া যায়।

ওই আওয়াজে জেলের খুনী আসামীটির সদ্য-আগত তন্দ্রাটুকু ছুটিয়া গেল। বেচারী জমাট অন্ধকারের মাঝে দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া বিহ্বলের মত দেখিতে লাগিল—এ কোথায় সে!

অন্ধকার—শুধু অন্ধকার! সহসা অ্যান্টিসেলের দরজার ঘুলঘুলি দিয়া কে একটা আলোক-রশ্মি নিক্ষেপ করিল। ওই রশ্মিটুকুতে তার নজরে পড়িল—গরাদে-ঘেরা পিঞ্জর-দ্বারের মত সুকঠিন দরজাখানা আর চারি পাশের নির্মম পাষাণ-বেষ্টনী।

সব মনে পড়িয়া গেল। জেলখানা, ফাঁসি!

উঃ, গলায় দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া দিবে; গলাটা সরু, লম্বা হইয়া যাইবে, চোখ দু'টা বিস্ফারিত বীভৎস—হয়তো বা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে; কত যন্ত্রণা,—উঃ কত যন্ত্রণা!—হয়তো বা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কত ব্যর্থ চেস্টাই তাহাকে করিতে হইবে।

সত্যই তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল যেন! নাসারন্ধ্রের লওয়া নিঃশ্বাসে আর কুলায় না,—মুখখানা আপনি হাঁ হইয়া যায়,—জিভটা বাহিরের দিকে টানে যে! বাঁকিয়াও যাইতেছে যে!—

কি বীভৎস,—কি ভয়াবহ!

বুক চাপড়াইয়া ও কাঁদিয়া উঠিল। বাহিরে সান্ত্রী হাঁকিল,—খবরদার।

তাহার আর কাঁদা হইল না। কিন্তু সে ভাবিতেও যেন আর পারে না। চুপ করিয়া আচ্ছন্নের মত মেঝের ওই সিক্ততাটুকুর উপরে ও পড়িয়া রহিল।

বাহিরে সব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে, ক্ষণপূর্বের আলোকে শব্দে বিচ্ছিন্ন রহস্য আবার যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু রজনী প্রবাহের একটা ক্ষীণ অবিচ্ছিন্ন সুর আর মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ওয়ার্ডারের বুটের আওয়াজ বাজিয়া চলিয়াছে—খট্ খট্—খট্—খট্!

শ্রান্ত চোখ দুইটা তার আবার তন্দ্রায় মুদ্রিত হইয়া গেল, আবার বাস্তবের দুঃসহ স্মৃতি নিদ্রার প্রশান্তিটুকু তার বিভীষিকায় পূর্ণ করিয়া দিল—

—বিশ্রাম, বিশ্রাম, একটু বিশ্রাম—তা না হইলে আর প্রাণ যে বাঁচে না।

—এই খানে,—হ্যাঁ, এই খানেই বেশ নির্জন, এই অন্ধকারে এই প'ড়ো-বাড়িটায় এই দোতলা কোঠাঘরে একটু বিশ্রাম। এখানে আর কে সন্ধান পাইবে ?

চারি রাত্রি ঘুম নাই, চারি রাত্রি ;—তিনটা দিন বিশ্রাম নাই, সোয়াস্তি নাই, ছুটিয়াছে, কেবল ছুটিয়াছে—প্রাণের জন্য শিয়াল কুকুরের মত ছুটিতে হইয়াছে। ঘুমে যে চোখ আপনি মুদিয়া আসে।

তাই হোক,—ঘুম আসে আসুক।

এই যে একটা শাবল ;—থাক শাবলটা হাতের গোড়ায়।

—তোরা আমার ঘরে আগুন দিলি, আমি দেব না ?

—আয় না সব দেখি—একা একা আয়, কে কেমন মরদ দেখা যাক! দেব শাবলের ঘায়ে পিণ্ডি পাকিয়ে।

—আমার জেল হলে তোদের হবে না ? হাকিম যখন জিজ্ঞাসা করবে, তোদের ঘরে না হয় আগুন দিলে ও, কিন্তু প্রথমেই ওর ঘরে আগুন দিলে কে ? নিজের ঘরে তো নিজে কেউ আগুন দেয় না! তখন ?

আমিও বলব, আমি আগুন দিইনি হুজুর, ঘরের আগুন ঘরে ঘরে লেগেছে, কাউকে লাগাবার দরকার হয়নি। তোরাই যাবি জেলে, আমি খালাস !

—এবার বাসিনীকে নিয়ে গ্রাম ছেড়েই চলে যাব। যেখানে খাটব

সেইখানে ভাত! বাসিনী! আঃ, সে কি সুন্দর কালো-পাথরে খোদাই করা চেহারাখানি, কি ঢল ঢলে চোখ, কি চুল—

—ও কি? বাইরে ও-শব্দ কিসের?

চাপা গলায় বাহিরে যেন কারা কথা কয়!

—ঠিক তাই, ওই যে বলছে 'এই ঘরেই। আমি একটু তফাতে ছিলাম, ওপরের কোঠায় ঢুকেছে।'

উঃ, এখানেও? এ তো রামা গয়লা!

ওই আবার কে কয়,—'থাক, তোরা চারিপাশ ঘিরে থাকে, যেন জানলা টানলা দিয়ে না পালাতে পারে, আমি ওপরে উঠছি।'

এ যে ভূপতি মিস্ত্রী, মিতে ভূপতি!

—উঃ, সে সুদ্ধ ওদের সাথে জুটেছে! শয়তান, দুনিয়াসুদ্ধ সব শয়তান। বন্ধুত্বের দাম নেই, কাউকে বিশ্বাস নেই। ওর পায় কাঁটা ফুটলে আমার সইতো না! আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই, আয়, আমিও কালী কামার; কই, এই যে শাবল। শালা হাতির মাথা চুর করে দেব।

নীচে তখনও যেন জল্পনা কল্পনা চলে,—'না না, ভূপতি, ওপরে যেয়ো না, বে-কায়দায় কি জানি—'

'কিছু ভয় নাই।'

'তবু, কাজ কি? পুলিসে খবর তো গিয়েছে।'

'না, ওকে না মেরে আমার মনের জ্বালা মিটছে না। আমার সর্বনাশ করেছে ও, আমি ওর কি করেছিলাম? জান, সমস্ত গাঁয়ের কথাতেও ওকে আমি ছাড়িনি তার ফল এই! দেখব আজ ওর কত হিম্মৎ!'

উপরে ও গর্জিয়া উঠিল,—হিম্মৎ? আও, চলা আও! ওঃ, হাতের শাবলটা নাচে যে! না, মিতে, মিতে—

ভূপতি বলিল,—হুঁশিয়ার তোরা, আমি উঠছি, ভূপতি মিস্ত্রীর হিম্মতটা দেখাব আজ।

—খবরদার ভূপতি! মেরে ফেলব, খুন করব, খবরদার—

—খবরদার কেলে! ধরা দে বলছি ভালোয় ভালোয়, নইলে জানে মেরে দেব! আর তোর পালাবার পথ নেই—

কালী ভাবিল,—ধরবে! ওই জানলা দিয়ে পালাই,—কিন্তু নীচেও যে লোক,—তবে? ধরলে ওরা নিশ্চয় সেই আগুনে ফেলে দেবে। ওই এল, কি করি, কি করি? এই যে শাবল হাতে রয়েছে, মার—

ওই পড়েছে! কেমন? ইস, ওকি? মুণ্ডুটা চেপটে বসে গেল! ঘিলু, রক্ত,—ইঃ—ইঃ—এখনও নড়ছে, এখনও নড়ছে,—উঃ—উঃ—

দারুণ বিভীষিকায় তাহার স্বপ্নালু তন্দ্রা আবার টুটিয়া গেল, পাগলের মত ও উঠিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু তার চোখের বিভীষিকার ঘোর তখনও কাটেনি—

—এই যে, এই যে রক্ত! উঃ,—কত রক্ত!

কৃষ্ণা একাদশীর নিশাতে তখন আকাশে চাঁদ উঠি উঠি করিতেছে, নিবিড় নিকষ কালো অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে; ওই স্বচ্ছতায় মেঝের উপর জলের দাগটুকুকে ওর স্বপ্ন-বিভ্রম-ভরা চোখে রক্ত বলিয়া মনে হইল।

ও হাত দিয়া তাড়াতাড়ি ওই সিক্ততাটুকু মুছিতে শুরু করিয়া দিল। কিন্তু মুছে না, সিক্ততাটুকুর পরিমাপ ঘর্ষণে ঘর্ষণে আরও বাড়িয়াই গেল।

—ও কে? অন্ধকার কোণে দাঁড়াইয়া ও কে? চেপটা, বসে-যাওয়া বীভৎস মুণ্ড, ঘিলু রক্তে ওই অঙ্গ ভেসে যাচ্ছে। ও কে? ভূপতি? হ্যাঁ, ও-ইত.

—এখনও মরে নাই! শাবল, কই শাবল?

—আচ্ছা, আয় নখে করে ওই বীভৎস মাথাটা ছিঁড়ে ফেলা যাক!

বাঘের মত অন্ধকার কোণে ওই অলীক ছাড়া-ছবিটার ওপরে ও ঝাঁপাইয়া পড়িল।

—কোথায়—কোথায় ভূপতি ?

দেওয়ালে ধাক্কা লাগিয়া দারুণ আঘাতে ও নিজেই নিস্পন্দের মত মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল।

তখন চাঁদ উঠিয়াছে। রাত্রি-শেষের হিমধারার সহিত ওই চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধতা গরাদের ফাঁক দিয়া সন্তর্পণে মেঝেয় প্রবেশ করিয়া ওর সর্বাঙ্গে যেন লঘু হস্তে শুশ্রূষার স্পর্শ বুলাইয়া দিল।

বাহিরে চারিদিক স্তব্ধ। শুধু সিপাহীর সেই অবিশ্রাম বুটের শব্দ ;—তাও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, ঠিক তালে তালে আর পড়িতেছে না। ওদিকে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কয়েদীদের অবসন্ন আচ্ছন্ন কণ্ঠ এলাইয়া পড়িতেছে, মাঝে মাঝে শোনা যায়, আবার যায় না।

তিন নম্বরে বাবুটি বালিশে মুখ লুকাইয়া বোধ করি কাঁদিতেছে।

চার নম্বরে তরুণটি বোধ করি তখন স্বপ্ন দেখে, শ্যামল ধরণীর বুক হইতে ওই আকাশ অবধি ব্যাপ্ত তার মায়ের রূপ, মায়েরই দীপ্ত কপালে শোভা পায় ওই চন্দ্রকলা, সীমান্তে জ্বলজ্বল করে ওই শুকতারা!

'লালটুপি'টাও তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, মুখে ওর মৃদু হাসি,—হয়তো বা গৃহ-পরিত্যক্তা প্রতীক্ষমানা তরুণী বধূটি ওর মনের বুকে গাঢ় আলিঙ্গনে শয়ন করিয়া কানে কানে কত কথাই বলিতেছে।

মূর্ছাহত আসামীটির আবার ধীরে ধীরে চেতনা ফিরিয়া আসিল, জাগিয়া বেচারা ভয়ার্তের মত চারিপাশে তাকাইতে লাগিল।

চন্দ্রকলার ক্ষীণ রশ্মিতে ঘরটা তখন বেশ দেখা যায়। দরজার গরাদেগুলার ছায়া বাঁকা বাঁকা হইয়া ঘরের মেঝের উপর বেশ স্পষ্ট জাগিয়া উঠিয়াছে।

—এ কি! এই যে রক্ত এখন স্পষ্ট দেখা যায়। ওই যে দরজার শিকগুলাতেও রক্ত!

ত্রস্তভাবে আবার ও মুছিতে শুরু করিয়া দিল।

হায়, হায়—মুছে না যে!

চারি-পাশে খুঁজিতে খুঁজিতে এক কোণে রাত্রির অভুক্ত ভাত তরকারিগুলি পাইল; তাহাই লইয়া ও জলের দাগের উপর লেপিতে শুরু করিয়া দিল।

—এ গুলা কি? ঘিলু, ঘিলু, মাথার ঘিলু! ওরই চর্বিত উদ্গিরীত উচ্ছিষ্টগুলিকে ওর ঘিলু বলিয়া ভ্রম হইল। সেগুলা সে ত্রস্তভাবে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

—ওই যে গরাদেগুলাতেও রক্ত! কিন্তু আর তো কিছুই নাই; কি লেপিবে?

—ওই যে টুকরিতে কাদা!

টুকরির দুর্গন্ধ মল লইয়া উন্মাদটা দুয়ারে গরাদেগুলোতে দু'হাতে মাখাইতে লাগিয়া গেল।

আঃ, মুছেচে, অনেকটা মুছেচে! এইবার নিশ্চিন্ত! আর কেউ ধরতে পারবে না।

আর কাঁদা হইবে না; স্ফুর্তি করিতে হইবে, হাসিতে হইবে,—

প্রাণপণে সে হাসিতে আরম্ভ করিল,—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং,—ভোর পাঁচটার ঘড়ি বাজিয়া গেল, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কয়েদী গুনিয়া দরজা খুলিয়া দিল। কয়েদীর দল বাহির হইয়া আসিল।

খুনী আসামীটার সেলের দুয়ার খুলিয়াই সিপাহীটা পিছাইয়া গেল—

ভিতরের দুয়ারে, আপনার সর্বাঙ্গে ওর ময়লা মাখান। আর লোকটা প্রবল ভাবে হাসিতেছে—হি হিং হি হি হি হি।

মেথর আসিয়া জল দিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিতে শুরু করিল।

কালীর সমস্ত বুকটা যেন ভয়ে কেমন করিয়া উঠিল,—ভিতরের রক্ত বাহির হইয়া পড়িবে যে!

ছুটিয়া সে মেথরটাকে ধরিতে গেল, মেথরটা ভয়ে পিছাইয়া আসিল। পাশের মেট গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আনিয়া সপাং সপাং করিয়া ঘা কতক বসাইয়া দিল ওর পিঠে। পাগল চেঁচাইতে চেঁচাইতে এক কোণে গিয়া গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া পড়িল। বসিয়া বসিয়াও সে প্রাণপণে সর্বাঙ্গ দিয়া দেওয়ালটাকে ঠেলিতে লাগিল। কিন্তু পাষাণ বেষ্টনী নড়ে না।

এবার ওকে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে পাঠান হইল,—স্থান হইল সিগ্রীগেশন সেলে।

ছয়

সেদিন সোমবার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েদীদের দেখিবেন,—ফাইল-বন্দী কয়েদীর দল সারি সারি দাঁড়াইয়া গেছে।

মাথায় টুপি, গায়ে হাতকাটা জামা, কোমরে গামছা বাঁধা, পরনে জাঙ্গিয়া, এক হাতে থালা বাটি, এক হাতে টিকিট। ঐ টিকিটে প্রত্যেকের বন্দী-জীবনের ইতিহাস লেখা আছে। অপরাধ, শাস্তি, বন্দী-জীবনের পুরস্কার, রোগ, ওজন, কোথায় কোন দাগটি আছে সেটি পর্যন্ত, ওদের কর্ম আর চর্মের কোন বিবরণটি বাদ যায় নাই।

কেষ্ট দাসের থালা বাটি ময়লা, জামা জাঙ্গিয়াও তাই।

গণেশ বলিল,—আজ তোমার খাড়া-হাতকড়ি।

ভয়ে কেষ্টর মুখ শুকাইয়া গেল। পাঁকাটির মত সরু সরু পা দুইখানা তার ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বেচারী কহিল,—পারিনে, জ্বরে জ্বরে সেরে দিলে যে।

চৈতন্য হাসিতে হাসিতে কহিল,—কবি করতে তো খুব পার, কবি করা বেরুবে তোমার আজ।

এ পাশের কয়েদীটা সহসা কেষ্টর গা টিপিয়া কানে কানে বলিল, —ডাকছে তোকে।

ইশারায় ইঙ্গিতে দৃষ্টি ফেলিয়া কেষ্ট দেখিল—পায়খানার ধারে দাঁড়াইয়া সেই ছোঁড়াটা।

ওদিকে যাইতে অজুহাতের অভাব হয় না। মিনিট কয় পরেই কেষ্ট ফিরিয়া আসিল। গায় ফরসা জামা, ফরসা জাঙ্গিয়া, থালা বাটি তা-ও যেন ঝকঝক্ করিতেছে।

ময়লা পোশাকে ছোঁড়াটা আসিয়া ওধারে দাঁড়াইল।

চৈতন্য কেষ্টকে শাসাইয়া দিল,—দাঁড়াও শালা, সাইদ আসুক আজ—

সাইদ সতরঞ্চি বোনে—সে আছে কারখানায়।

ওধার হইতে জমাদার জোরসে হাঁকিয়া উঠিল,—সরকার—

মেট হাঁকিল,—সেলাম।

এরা সেলাম বাজাইল।

সাহেব সকলকে দেখিয়া দেখিয়া চলিয়াছেন,—পিছনে জেলার, জমাদার, ওয়ার্ডার।

বুড়া মাঝিটার সামনে আসিয়া সাহেব দাঁড়াইয়া গেলেন। লোকটার পোশাক যেমন ময়লা, থালা বাটিও তেমনি অপরিষ্কার—গত সন্ধ্যার খাবারের দাগও সম্পূর্ণ যায় নাই। সাহেবের ইঙ্গিতে জেলার জিজ্ঞাসা করিল,—থালা বাটি এত ময়লা কেন ?

বুড়া মাঝি পরম ঔদাস্যভরে উত্তর দিল,—আমারি তো এঁটো—

উত্তর শুনিয়া সাহেব ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন,—নন্‌সেন্স !

তারপর ওর টিকিটখানা লইয়া খসখস করিয়া লিখিয়া গেলেন,—'পেনাল ডায়েট।'

ছোকরাটারও হইল তাই, কারও হইল হাতকড়ি, কারও রেমিশন কাটা গেল।

কেষ্ট দাসের রেমিশন মিলিল একদিন বেশী,—পরিচ্ছন্নতার পুরস্কার। টিকিট সই করিতে করিতে সাহেবের নজর পড়িল—ওজন ওর দশ পাউণ্ড কম। সাহেব বিস্মিতের মত কেষ্টর টসটসে মুখখানার পানে তাকাইয়া বলিলেন,—উর্দি উঠাও।

কেষ্ট গায়ের জামা উঠাইল,—ভিতরে শুধু চামড়া ঢাকা একটা কঙ্কাল।

আবার সাহেব ওর টিকিটে হুকুম লিখিয়া দিলেন,—ওজন কমের জন্য হাসপাতালের খাবার।

জেলার বলিয়া দিল,—হাসপাতালের খাবার পাবি।

আনন্দে কেষ্টর টসটসে মুখখানা যেন জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

সাহেব চলিয়া যাইতেই কেষ্ট আসিয়া ছেলেটার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল ;—বেচারী কৃতজ্ঞতা জানাইতে চায়, কিন্তু ভাষা খুঁজিয়া পায় না যেন।

ছেলেটা হাসিয়া কহিল,—জোর বরাত তোর।

—আধখানা মাছ কিন্তু তোকে খেতে হবে।

—না-না, খেয়ে দেয়ে তুই একটু তাজা হয়ে নে, তার পর।

অতি ব্যগ্রতাভরে কেষ্ট বলিল,—না-না, তোকে খেতেই হবে। না আমার দেওয়া খাবিনে ?

—জানিস তো সাইদ আলিকে ? ছেলেটা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

—আমি লুকিয়ে দেব।

—আচ্ছা দিস। কিন্তু তুই এত বোকা কেন ?

—কেন ?

—জেলখানায় কেউ কাউকে কিছুর ভাগ দেয় জানিস ? আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

—তবে তুই দিলি কেন ?

—আমার কথা ছেড়ে দে,—আমার আবার অভাব কি ? হাত্ত পাতলেই হল। তা ছাড়া তুই রোগা, তোকে দেখে কেমন মায়া হয়।

কেষ্টর চোখ দুইটা কেমন ছলছল করিয়া উঠিল। ছেলেটা লক্ষ্য করিয়াছিল, কহিল,—আয় বিড়ি খাবি, ওই নেবু গাছের আড়ে,—

নেবু গাছের তলায় গুঁড়ি মারিয়া ঢুকিয়া দু'জনে বিড়ি ধরাইল। কেষ্ট ভয়ে এদিক ওদিক তাকাইতেছিল, ধমক দিয়া ছোঁড়াটা বলিল, —দু-রো, এত ভয় কিসের ?

কেষ্ট লজ্জা পাইল ;—না, ভয় আমি কাউকে করিনে। তবে

কি জানিস, রোগা শরীর, এখনই শালা পড়ে পড়ে মার খেতে হবে, হয়তো মরেই যাব।

কেষ্টর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ছেলেটা বলিল,—তোকে আমার বেশ লাগে জানিস?

কেষ্ট কহিল,—তোর মত আমার একটা ভাই আছে, মাইরি, ভারী ফুর্তি তার।

—ভাগ শালা, বলিয়া ছেলেটা রাগ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

* * *

কারখানার ভিতর—

মানুষে ঘানি টানে। লোহার ডাণ্ডাটা চাপিয়া ধরিয়া মানুষগুলি ঘানির চারিপাশে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়াই চলিয়াছে—ঘুরিয়াই চলিয়াছে; ছাড়িয়া দিয়া বিশ্রামের উপায় নাই। এমন কৌশলে ঘানিগুলা তৈরী যে, ছাড়িয়া দিলেই ডাণ্ডাটা থামিয়া পড়িয়া যাইবে,—শুধু পড়িয়া যাইবে নয়, সমস্ত ঘানিটাই বিকল হইয়া যাইবে।

কিন্তু ওরাও কম চতুর নয়! এর উপায়ও ওরা আবিষ্কার করিয়াছে। পরিশ্রান্ত ঘর্মাক্ত বুকে লোহার ডাণ্ডাটা এমন কৌশলে ধরিয়া বিশ্রাম করে যে, পড়ে না। কখনও বুকে, কখনও পিঠের খাঁজে লাগাইয়া দাঁড়াইয়া স্বচ্ছন্দে হাঁপায়।

ঐ সোমবার দিনই—

ঘানি চলিতেছিল। ওপাশে সাইদ সতরঞ্চি বুনিতেছিল, গণশা কামারের কাজে, চৈতনা ছিল ঘানিতে। একটা নতুন আসামী ঘানি টানিতে টানিতেই গান ধরিল—

"মা আমায় ঘুরাবি কত?"

লোকটির বয়স হইয়াছে, অন্য জেল হইতে হালে চালান আসিয়াছে।

গান শুনিয়া আর এক জনেরও গানের নেশা পাইয়া বসিল, সে-ও গান ধরিয়া দিল—

"ঘানি টানি পানি পানি করে যে জান যায়,
কোথা রৈলি প্রাণ-প্রেয়সী কলসী কাঁখে আয়।"

লোকটা নতুন,—গানটা পুরানো; কোন কয়েদী-কবির রচনা।

চৈতনা হাসিয়া কহিল,—এরই মধ্যে কলসী? তবে ঢেঁকিতে করবে কি নাগর?

—ঢেঁকিতে খুব কষ্ট না কি?

—চরম। পায়ের শিরগুলো ছিঁড়ে যায়, মনে হয় শালা লে-আও দড়ি—গলায় দিয়ে ঝুলে পড়ি।

গণশা হাতুড়ি পিটিতে পিটিতে কহিল,—ঘানিতে আবার কষ্ট কি? পাক কতক ঘুরেচি কি মেরে দিয়েচি।

চৈতনা বাঁ হাতে লোহার ডাণ্ডাটায় দুইটা চাপড় মারিয়া বলিল,—এর আবার ওজন কি? নামেই লোহা, কাজে কিছু নয়। প্রথম পাক চার কষ্ট, তারপর ঘুরণ পাকের নেশাতেই চলে। কোন্ কোটালের মা ঘানিতে চেপে সগ্গে গিয়েছিল না?

ওপাশ হইতে একজন উত্তর করিল,—চেপেছিল,—এক চোর।

বেশ একটা হাসির কলরোল বহিয়া গেল।

নবাগত প্রৌঢ় লোকটি কহিল,—সে নিশ্চয় ভদ্দরলোক চোর?

গণশা কহিল,—কেন, ভদ্দর লোক কিসে বুঝলি?

নতুন ছোকরাটি কহিল,—তা নইলে এমন ফিচলেমি বুদ্ধি হয়? আমরা জানি রে রে রে করে কেবল ডাকাতি করতে।

—বেশ বলেছিস, ভদ্দরলোক না মানেই ফিচেল, আর সব শালাই চোর। কেউ করে কলমের ডগায় চুরি, কেউ করে পিঠে হাত বুলিয়ে চুরি, কেউ দরের মাথায় চুরি।

নবাগত প্রৌঢ় লোকটি কহিল,—আরে দুনিয়াতে চোর নয় কে? কেউ চোর, কেউ ফাঁকিবাজ। দেখিয়ে চুরির সাজা নেই, লুকিয়ে চুরি করলেই ফাটক খাট।

গণশা হাতুড়িটি পাশে নামাইয়া রাখিয়া বলিল,—জানিস্ মাইরি, আমাকে যদি দুনিয়ার রাজা করে দেয়, তো আমি দুনিয়াটাকেই একটা জেলখানা করে দিই। সব বাবা খাট আর খাও, খাও আর খাট, পয়সা কেউ পাবে না।

প্রৌঢ় কয়েদীটা পরম দার্শনিকের মত গম্ভীর ভাবে কহিল,—আরে তা হলে কি কেউ চুরি করত রে? চুরি করে মানুষ অভাবে, হিংসেয়, লোভে। যদি বড় ছোট দুনিয়ায় না থাকে, তবে কে কার হিংসে করবে? কারও ঘরে যদি সোনা দানা বোঝাই হয়ে না থাকে, তো লোভ করবে কিসের, অভাবই-বা বুঝবে কিসের আর চুরিই-বা করবে কেন?

—তা হলেও করত। চোর চুরি না করে থাকতেই পারে না। এক সন্নেসী চোরের গল্প জান না? বেটা সন্নেসী হয়েও চুরি না করে থাকতে পারত না, সব্বার ঝোলা ঝাপটা রাত্তিরে উলটে পালটে রেখে দিত।

নতুন কয়েদীটি বলিল,—জানি, সে শেষে নাকি সিদ্ধিও পেয়েছিল। তা হলেই বোঝ না, নিশ্চয় সে শেষটায় সাধু হতে পেরেছিল। কিন্তু যদি তাকে জেলখানায় আসতে হত, তবে কি আর সাধু হতে পারত?

লোকটির দার্শনিকতায় মুগ্ধ হইয়া গণেশ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল,—ওস্তাদের বাড়ি কোথা?

ওস্তাদ আপন পরিচয় দিয়া কহিল,—ডাকাতি করলাম ঢের এই পঞ্চাশ বছরে, পঁচিশ বছরে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত গোটা ষাট সত্তোর তো হবে। দেখলাম, একটা একবার আরম্ভ করলে হয়, তারপর আর বাঁধ মানে না। তবে আমার ডাকাতি হিংসেয়, লোভে, অভাবে এ আমি ঠিক বলতে পারি। কতবার চেষ্টা করেছি ভাল হয়ে থাকতে, তা শালারা থাকতে দিলে না। জেল থেকে বেরুলাম, শালারা ফের এক মামলায় জড়ালে,—মামলার খরচ যোগাতে ফের ডাকাতি, ফের জেল, জেলে আবার নতুন দল—তাদের সঙ্গে মিশে আবার। আর, পরের কেড়ে

নেওয়াতেও যেন কেমন একটা সুখ আছে। এ-সুখ একবার পেলে মানুষ আর তা ছাড়তে চায় না, যেমন বাঘের রক্তের স্বাদ আর কি।

এরপর কতক্ষণ সব নীরব; সবাই যেন ওস্তাদের কথাটা মনে মনে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছিল। প্রথম কথা কহিল চৈতনা,—যা বলেছ ওস্তাদ! পরের কেড়ে কুড়ে নেওয়ায় সত্যি সুখ আছে।

সমর্থন পাইয়া দার্শনিক আবার উৎসাহভরে আরম্ভ করিল,—দেখ না, চোর, জোচ্চোর, ডাকাত, ঠগী, লুঠেরা, মায় রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, তা-ও ওই তাই। ভদ্দর লোকেরা বড় বড় মাথায় এসব বেশ ভাল বোঝে; তাই তো এত সব ফ্যাসাদ,—থানা, পুলিস, সেপাই, সান্ত্রী। আর শালা মানুষ মারবার কলই কত রকম রোজ রোজ তৈরী হচ্ছে! লাঠি, সড়কি, তীর-ধনুক, বন্দুক, কামান, আজকাল না-কি কামানের মুখের ধোঁয়ায়ও মানুষ মরে। আচ্ছা বল দেখি, এসব তৈরী কিসের জন্যে? একটা কথা আছে জানিস্, সাধুর দৌলত মালা, ভিখারীর দৌলত ঝোলা, চাষার দৌলত মাটি, চোরের দৌলত সিঁধকাঠি— আর মানুষমারা কল বন্দুক কামান, সে-তো তোর লাঠিরও বাড়া। এ সব হল যুদ্ধের জন্য—যুদ্ধে হয় রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি।

গণেশ কহিল,—তাইতো বলছিলাম ওস্তাদ, দেয় ভগবান আমাকে দুনিয়ার রাজা করে, তো দেখি আমি একবার। সব জেলে ভরে দি।

চৈতনা বলিল,—আর তুই শালা ধর্মপুত্তুর থাকবি শুধু বাইরে?

কথাটার উত্তর দিল দার্শনিক,—সে তো নিয়মই। আইন বল, কানুন বল, সাজা বল, জেল বল, সব নিজেকে বাদ দিয়েই মানুষে করে, তারও ভয় হয়—

বাধা দিয়া গণেশ বলিল,—না ওস্তাদ, ও-কথাটা ঠিক হল না,—

জোর যার আছে তার আবার ভয় কিসের? সে তো সব সোজাসুজিই করতে পারে।

প্রৌঢ় লোকটি কহিল,—কথাটা মিথ্যে বলনি; কিন্তু মানুষ-যে মানুষেরই ভয়ে অস্থির! বাঘ ভাল্লুককে মানুষ যত ভয় না করে—তার বেশী ভয় করে মানুষকে। আর মানুষের স্বভাব কি জান? ফাঁক পেলেই সে বর্তমানকে উলটে দেবে। সন্তুষ্ট কিছুতেই হয় না। সেই তো ভয়। রাজা বল, প্রজা বল, ভয়-যে সব মানুষেরই আছে। ভয় নেই এমন মানুষ নেই,—ভীতু সবাই—

নতুন ছোকরাটিও গণেশ চৈতনার দেখাদেখি দার্শনিক কয়েদীটিকে ওস্তাদ বলিতে শুরু করিয়াছিল; সে প্রতিবাদ করিয়া কহিল,—এ কথা তোমার মত লোকের মুখে সাজে না ওস্তাদ—আমরা সব ভীতু? আমরা—

ওস্তাদ হাসিয়া কহিল,—জরুর, একশোবার। নইলে রাত্রের অন্ধকারে লুকিয়ে ডাকাতি করিস্ কেন? লোকে চিনে ফেললে খুন করিস্ কেন? ভয়, ও সব ভয়ের কাজ! আজকাল যে যুদ্ধ হয় জানিস্, তাও লুকিয়ে লুকিয়ে। এই যে আমাদেরই এমনি করে ধরে রেখেছে, শুধু কি আমরা পরের ক্ষতি করছি বলে? আরে পরের ক্ষতি তো দিবা রাত্রি হচ্ছে,—একজনের ক্ষতি না হলে আর একজনের লাভ হবে কি করে? আর সে-সব শিক্ষিত লোকেরা এমন কলে-কৌশলে করছে যে, চোখের ওপর দেখেও তা ধরবার ছোঁবার উপায় নেই। আমরা গায়ের জোরে ক্ষতি করেছি, কেবল এই আমাদের দোষ।

কথাগুলা নতুন ছোকরাটির বেশ বোধগম্য হইল না বোধ হয়,—আর ভীরুতার অপবাদে সে চটিয়াছিলও দারুণ। সে চট্ করিয়া কহিয়া বসিল,—ছাড়ান দাও কর্তা, তোমার ও সব কারো মাথায় ঢুকছে না। যত সব উদ্ভট উদ্ভট কথা। আমাদের ভয়? আমরা ভীতু, দূর দূর, যত সব, হুঁঃ—

ওস্তাদ একটু হাসিল, কোন প্রতিবাদ করিল না, আপন মনে ঘানি টানিয়া চলিল।

ওদিকে কথার মোড়টা তখন ফিরিয়া গিয়াছে। গণেশ চৈতনাকে কহিতেছে,—কেষ্টা শালার জামা বদলের কথা বলেছিস্ ?

চৈতনা হাসিয়া চুপি চুপি কহিল,—কোন কালে ! দেখ না, সাইদের মুখখানা একবার দেখ না !

সত্যই সাইদের মুখখানা অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর। সতরঞ্চির টানার সুতায় প্রায়ই ঘর ভুল হইয়া যাইতেছে। গণশা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—যেন আষাঢ়ে-মেঘ নেমেছে, দেবে আজ ঘা কতক, দেখিস তুই।

ওদিকে পিঠে লোহার ডাণ্ডাটা লাগাইয়া বেশ হেলান দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তখনও সেই ছোকরাটি ভয়শূন্যতার কথা প্রচার করিতেছিল,—ফুঃ,—বলে বন্দুক, বন্দুককে কে কেয়ার করেরে বাপু ! বন্দুক ছোড়া চাইতো ? বলে বিশ পঁচিশ মরদে যখন আ-আ-আ হাঁক হাঁকে, তখন যাকে বলে সেই 'তোর হাতের ফাঁসী রইল হাতে, আমায় ধরতে পারলি না'। এই তোমার বেশী দিন নয়, রায়েদের বাড়িতে দু' দুটো বন্দুক, বাড়ির মেজবাবু আর সেজবাবু,—ওড়া-পাখি বিঁধে পেড়ে ফেলে, বাবা, সে সময় ওই হাতের বন্দুক রইল হাতে, হেঁ—হেঁ।

গর্বিতভাবে একটু হাসিয়া আবার বলিয়া চলিল,—আমরা যখন কাজটাজ সেরে গাঁয়ের বাইরে, তখন শালা ফটাং ফটাং ফটাং, যেন পাখি বাসাতে গিয়ে মরে থাকবে।

'কালাপাগড়ি' আসিয়া কহিল,—'চৈতন্য চরণ দাস্', 'সাইদ আলি' পত্র আছে তোমাদের।

—পোস্টকার্ড ?

হা হা, ঘানি পড়ে যাবে চৈতনা—ঘানি পড়ে যাবে। যা—যা, এইবার যা, আমি ধরেছি ঠিক।

সাইদ আলির হাতের সতরঞ্চির সুতার তালটায় ফাঁস পাকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি মুক্ত করিবার জন্য নানাভাবে সে যত চেষ্টা করে, ফাঁসের পর নতুন ফাঁসে সেটা ততই যেন বাঁধা পড়িয়া যায়।

চৈতনা ডাকিল,—আরে সাইদ মিঞা, এস—

সাইদ ব্যস্তভাবে আর একবার ফাঁসটা খুলিবার চেষ্টা করিল, এবার আরও একটা নতুন ফাঁস লাগিয়া গেল। সাইদ পট্ করিয়া সুতার তালটা ছুড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল।

প্রৌঢ় লোকটি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, চৈতনা ও সাইদ চলিয়া যাইতেই একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া একান্ত মনোযোগের সহিত আবার ঘানি টানিতে শুরু করিল।

গণশা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল কে জানে,—চিঠি না আসাই ভাল, চিঠি এলে আমার তো হাত পা কাঁপে! ওই-যে কালির হিজি বিজি, হাকিমের রায় শুনতেও বুক এত ঢিপঢিপ করে না। হয়তো লেখা থাকবে, তোমার পুত্তরটি তিন দিনের জ্বরে—যাঃ শালা, ভেঙে গেল।

হাতুড়িটি এমন ভাবে সে মারিয়াছে যে, সাঁড়াশিতে-ধরা লোহাটা ফাটিয়া ভাঙিয়া গেছে।

চৈতনা ফিরিয়া আসিল নাচিতে নাচিতে, তাহার চিঠির খবর নাকি খুব ভাল—ধান খুব ভাল হইয়াছে, ছেলেটা হাল ধরিতে শিখিয়াছে,—এবার নাকি নিজেই বাড়িতে হাল গরু কিনিবে! সব চেয়ে ভাল খবর হইতেছে—হাইকোর্টে তাহার আপীল মঞ্জুর হইয়াছে, খালাসের সম্ভাবনাই নাকি আঠার আনা! তবে মা চামুণ্ডার মাথায় মানত করিয়া

ফুল চাপান হইয়াছিল,—সে ফুল মাথা হইতে টপ্ করিয়া পড়িয়া গিয়াছে। শেষ দিকটায় একটু হতাশা প্রকাশ করিয়া কহিল,—এর ওপর তো আর কারু হাত নাই! বাবা! এ হাইকোর্টের হাইকোর্ট! মায়ের মাথা হতে ফুল পড়ে না তো পড়েই না—আর যদি পড়লো তো একেবারে নিঘ্যাৎ।

ওস্তাদ একটু হাসিয়া কহিল,—মায়ের মাথা তো গোল?

চৈতনা একেবারে আগুন হইয়া উঠিল। কহিল,—হাঁ গোল, গোল তার হবে কি? গোল হলেই বুঝি ফুল পড়ে? কই চাপাও দেখি তুমি, পড়ুক তো একবার দেখি। এ বাবা যে-সে নয়—মানুষের গড়া-পেটা দেবতা নয়,—সাক্ষাৎ শিলে রূপ—পাষাণ! জান একবার এক দল ডাকাত যেতে যেতে মায়ের থানে পেন্নাম করেনি,—তা দলকে দল একবারে—

সহসা কেষ্ট হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় চৈতনার কথাটা মাঝপথেই বন্ধ হইয়া গেল। কেষ্ট কহিল,—গোসাঁইজী এসেছে—গোসাইজী।

গোসাঁইজী একজন 'কেষ্ট বিস্টু' ইহাদের কাছে। এইস্থান হইতেই অন্য জেলে চালান গিয়াছিলেন, আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। গোসাঁইজী সাধু-সন্ন্যাসী ব্যক্তি; ঝোলার ভিতর একটা খুনী মামলার মাল বাহির হইয়া পড়ায় সাত বৎসরের জন্য মেয়াদ খাটিতেছেন। গুণী লোক! হাত দেখিয়া অদৃষ্ট গণনা, শুধু হাতে সুগন্ধ আনা, ঘটার জলে হাত গুলিয়া সরবত বানানো ইত্যাদি হরেক রকম কসরত তার জানা আছে। জেলের ওয়ার্ডার মহলে বেজায় খাতির! জেলার, ডেপুটী-জেলার পর্যন্ত বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। না দেখিয়া উপায় কি;—ডেপুটী-জেলারের কন্যার পেট-কামড়ানি তিন ফুঁকে গোসাঁই ভাল করিয়াছেন, জেলারের তিন সের দুধের গাইটির দুধ ডাইনীতে হরণ করিত, গায়ে হাত বুলাইয়া গোসাঁই সে দুধ ফিরাইয়াছেন।

মোট কথা চাণক্য পণ্ডিতের 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা' শ্লোকটি গোসাঁইজী সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

স্বদেশী বাবুদের ওয়ার্ডে গোসাঁই-এর নাম—'রাসপুটীন'!

চৈতনা গোসাঁই-এর সংবাদ শুনিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল,—এই জিজ্ঞেস কর না গোসাঁইকে—ও যদি 'না' বলে, তখন আমাকে বলো, হ্যাঁ—

ঠিক এই সময় এগারটার ঘণ্টা বাজিয়া গেল। কয়েদীদের স্নান আহারের সময়,—এগারটা হইতে দুইটা পর্যন্ত বিরাম।

কাজ ছাড়িয়া সব হুটপাট করিয়া ওয়ার্ডের দিকে চলিল।

তিন নম্বর ওয়ার্ডের দরজায় ভীড় জমিয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর গোসাঁইকে ঘিরিয়া প্রকাণ্ড এক চক্র বসিয়াছে। গোসাঁই 'কালাপাগড়ি'র হাত দেখিতে দেখিতে কহিতেছেন,—এক বরিষ ছ' মাহিনা কি দো বরিষ—ইস্‌কো মধ্যে তোমার খালাস।

'কালাপাগড়ি কহিল,—ই ক্যা বোল্‌তে হায় আপ, হাম্‌রা তো ফর লাইফ মেয়াদ হুয়া—

গোসাঁই কহিলেন,—জরুর হোগা—হোতে বাধ্য।

'কালাপাগড়ি'র মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—ক্যায়সে হোগা?

—আরে ক্যায়সে হোগা! হোগা, এ্যায়সেই! এই একঠো যুদ্ধ টুদ্ধ হোগা, জিত হোগা—ব্যাস, তোম মাপ পা যায়েগা।

ভীড়ের মধ্য হইতে কে একজন কহিল,—যুদ্ধ হোগা?

মুখ তুলিয়া গোসাঁই দড়ি বাঁধা চশমার ফাঁক পানে চাহিয়া কহিল,—হাঁ হাঁ, হোগা, আলবাৎ হোগা, লাগলো বলে!

রোগা কেস্ট উল্লাসে বুক চাপড়াইয়া কহিল,—যুদ্ধে তাহলে এবারও তো জেল থেকে লোক নেবে? হামি যায়েগা, জরুর যায়েগা।

চৈতন্য কহিল,—তা হলেই হয়েছে, শালা বন্দুকের আওয়াজ শুনেই কুপোকাৎ!

কেষ্ট অসহিষ্ণু ভাবে কহিল,—হই হবো, জেল থেকে তো খালাস পাবো! এর নাম কি বাঁচা? এর চেয়ে বন্দুকের গুলীতে মরি সে-ও ভালো।

তহিদ কেষ্টর পিঠে হাত দিয়া কহিল,—না, তুই কি করতে যাবি? তোর তো আর এক বছর; আমি কিন্তু জরুর যাব।

—দু'মাস আগেও যদি বেরুতে পারি তাই কি কম রে? আমি যাবই তুই দেখিস্।

ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে ভিড় ঠেলিয়া সাইদ আলি আসিয়া গোসাঁই-এর সম্মুখে হাতটা মেলিয়া দিয়া কহিল,—দেখতো গোসাঁই ক'টা বিয়ে আমার!

চৈতন্য গণশার কানে কানে কহিল—জানিস্? আজ খবর এসেছে সাইদের পরিবার নেকা করেছে।

গোসাঁই সাইদের হাত দেখিয়া হাসিয়া কহিল,—বিয়েতো দেখি তোর তিনটে, আর—

সাইদ গোসাঁইকে আর হাত দেখিতে দিল না, রূঢ় ভাবে হাতটা টানিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে একটা 'হুঁ' বলিয়াই উঠিয়া পড়িল।

কয় পা গিয়া আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া সাইদ হাতটা প্রসারিত করিয়া কহিল,—দেখ তো মরণ আমার কিসে হবে, ফাঁসিতে না—কি?

গোসাঁই মৃদু হাস্যে সাইদের হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া কহিল,—মৃত্যুর কথা বলতে নাই, গুরুর মানা আছে, বলিয়া সে গুরুর উদ্দেশ্যে কপালে হাত ঠেকাইয়া একটা নমস্কার করিল।

সাইদ যেমন ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়াছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই চলিয়া গেল।

সাত

মাসখানেকের ভিতর জেলখানার আবহাওয়া যেন কেমন এক রকম হইয়া উঠিয়াছে।

নরুর অবস্থা অতি শোচনীয়। তিলে তিলে দীর্ঘ ত্রিশ দিনে তাহার দেহের উপর মরণ আপনার অশরীরী রূপের ছাপ সুপরিস্ফুট ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, যেন কোন সুদক্ষ চিত্রকর তুলিকার পর তুলিকা চালাইয়া পটভূমির উপর একটি মৃত্যুর চিত্র আঁকিয়া চলিয়াছে—পাণ্ডুর, স্থির, জীর্ণ সে রূপ, কঙ্কালসার মুখখানি কিন্তু অপূর্ব আনন্দের জ্যোতিতে উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত ; হয়তো-বা মরণ-ম্লান দেহখানির মধ্যে অবশিষ্ট জীবনের দীপ্তি সেটুকু !

জেলের অপর সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের অন্য অন্য জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সাধারণ কয়েদীদের উপর খুব কড়াকড়ি ; খাও দাও, কাম বাজাও, কথা কি গল্প করিবার হুকুম নাই। সন্ধ্যা হইতেই কম্বল চাপা দিতে হয়, ঘুম না আসে—আকাশ পাতাল ভাবনা ভাব, কারণ খিলানের ছাদে কড়িকাঠ নাই যে, গনিয়া সময় কাটিবে।

অপরাধ-সংস্কারগ্রস্ত জীবনগুলিও যেন কেমন হইয়া উঠিয়াছে ! একটা সুগভীর বিষাদের কালিমায় যেন সব আচ্ছন্ন, চটুল হাসির তারল্যকে যেন সব নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে। গৌর, তহিদ, কেষ্ট, গণেশ, সবারই যেন কেমন একটা থমথমে ভাব, অন্ধকার বাদল রাত্রির মত উদাস, বিষণ্ণ, স্তব্ধ। সাইদ পত্নীর বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদে কেমন উগ্র, অধীর হইয়া উঠিয়াছিল—এখন সে-ও যেন ও-কথাটা আর ভাবিতে পারে না, এই খেয়ালী অদ্ভুত ছেলেটির কথা তাহারও মন

জুড়িয়া বসিয়াছে। ছোকরাটা আর লাফ দেয় না, ডুবড়ির মত মুখ তাহার এই উদাস শীতল আবহাওয়ায় নিভিয়া গিয়াছে।

সুরেশবাবু, তিন নম্বরের সেই বাবু-চোরটি জেল পরিবর্তনের জন্য দরখাস্ত দিয়াছে; ডেপুটী-জেলার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিল,—দেখুন জীবনে এমনটি আমি কখনও ভাবিনি। আজ জেলখানাটাকে সত্যি আমার ভয় হচ্ছে। আমি এসেছি আজ কম দিন নয়, ফাঁসি—তা-ও দেখেছি, কিন্তু এমন হয়নি—ঘণ্টা কয়েক পরেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। কিন্তু এ কি? মৃত্যু যেন চব্বিশ ঘণ্টা জেলখানার ভিতর পা টিপে টিপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানেন, পায়খানার মেথর ওই উমেশ ময়রা, লোকটা জেল খাটবে আরও কতবার সেই কল্পনায় মেথরের কাজটা করে,—তারও যেন কেমন একটা পরিবর্তন! দেখি বসে বসে একটা বই পড়ছে। একটা দপ্তর আছে ওর। একখানা অশ্লীল গানের বই আগে ওকে পড়তে দেখেছি। জিজ্ঞাসা করলাম,—কি গান শিখছ উমেশ?

উমেশ বললে,—এটা গানের বই নয় বাবু—

জিজ্ঞাসা করলাম,—কি বই ওটা?

দেখালে, দেখলাম ব্যাকরণ-কৌমুদী একখানা। আশ্চর্য হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—তুমি বুঝতে পার এ?

ও বললে,—না, সংস্কৃত লেখা রয়েছে, মন্ত্র টন্ত্র হবে। আরও বললে—আর ও-সব গানের বই ভাল লাগছে না বাবু; জীবনে তো অনেক পাপই করেছি, এবার দু'একখানা ভাল বই পড়ে যদি মতি-টতি ফেরে। সে পর্যন্ত পাপের ভয়ে মুষড়ে পড়েছে। আমার এক এক সময় কি মনে হয় জানেন? যদি ছেলেটি আহার করব বলে, তবে হয়তো পাথরের পাঁচিলটা পর্যন্ত ওর পায়ে বিন্ধ্যগিরির মত মাথা লুটিয়ে ফেলবে।

কতক্ষণ সব নীরব, নিঃশ্বাসগুলি পর্যন্ত যেন সন্তর্পণে বহিতেছিল,

সহসা সুরেশবাবু আবার কথা কহিল,—থাক্ গে! সেই লোকটা, সেই কালী কর্মকারের খবর কি? সে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে, নয়?

ডেপুটীবাবু কহিলেন,—হ্যাঁ, লোকটা সেরে উঠেছে,—লোয়ার কোর্টের বিচার শেষ হয়েছে—সেসনে গেছে কেস। সে বিচার আরম্ভ হতেও আর দেরি নাই।

—লোকটা আর সেই আর্তনাদ করে না?

—না, তবে কাঁদে, চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ে, ঠোঁট কাঁপে, কিন্তু চেঁচায় না। মনে হয় ফাঁসিও যদি হয়, তো সয়ে নিতে পারবে—prepared হয়ে যাবে।

সুরেশ কিছুক্ষণ বিস্মিতের মত ডেপুটীবাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তার পর অতি ধীরে ধীরে ঘাড় দোলাইয়া কহিল,—না, মনে হয় না, না ডেপুটীবাবু, এ অসম্ভব। ওই লোকটির জীবনের জন্য যে আর্তনাদ শুনেছি, তাতে কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারব না।

ডেপুটীবাবু হাসিয়া কহিলেন,—না সুরেশবাবু, এ অনেক দেখেছি। মৃত্যুদণ্ডের আদেশের পূর্ব পর্যন্ত যে-কান্না মানুষে কেঁদেছে, তাতে মনে হয়েছে ফাঁসিই যদি হয় এর, তবে আদেশ শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু দেখেছি ফাঁসির হুকুম নিয়ে সে ফিরে এল—ধীর স্থির, কোন চাঞ্চল্য নাই তার।

সুরেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল,—হয়তো বা মৃত্যুর আদেশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আপনাকে, মানে self কে চিনতে পারে,—জীবনের চেয়েও বড় কেউ তার ভেতরে জেগে ওঠে। মানবের জাগরণ, এই হয়তো মানবের জাগরণ,—যা ওই ছেলেটি জন্ম থেকে নিয়ে এসেছে;—না, ওর সঙ্গে কিছুর তুলনা করা ঠিক নয়, ও আমাদের কল্পনার বাইরের বস্তু।

ডেপুটীবাবু কোন উত্তর করিলেন না, হয়তো বা দিবার মত উত্তর তাঁহার মনে জোগাইল না। সুরেশও নীরব হইয়া কি একটা ভাবনায়

যেন ডুবিয়া গিয়াছিল, সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আচ্ছা ডেপুটীবাবু, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, আমিও ওই ভাবে মরণের সম্মুখে দাঁড়াতে পারি?

ডেপুটীবাবু এবারও কথা কহিলেন না। তিনি এই খেয়ালী লোকটির মুখপানে চাহিয়া বোধকরি ভাবিতেছিলেন,—এ আবার কোন্ খেয়াল!

সুরেশ নিজেই আবার কহিল,—না, তা পারি না। রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র ভাবে কেটে যায়, তখন মনে হয় গলা টিপে ওই অবশিষ্ট জীবনটুকু শেষ করে দিয়ে আসি। পাপ বলে কোন বস্তুকে আমি বিশ্বাস করিনি, সমাজশৃঙ্খলার পরিপন্থী বলে, বেআইনী বলেই বিশ্বাস করে এসেছি। সেই পাপ যেন চোখের সম্মুখে আজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে উঠেছে। দোহাই আপনার—আমার ট্রান্সফারটা যাতে হয় তার ব্যবস্থা করুন; জীবনের সমস্ত সঞ্চয় আমার কর্পূরের মত উপে যাচ্ছে। এতদিনের পথ-চলা যদি আমার আজ মিথ্যা হয়ে যায়, তবে যে আমার আত্মহত্যা বই উপায় থাকবে না!

সুরেশ যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল—চোখ দুইটায় অস্বাভাবিক দৃষ্টি, সমস্ত শরীর দিয়া বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে।

ডেপুটীবাবু কহিলেন,—এত চঞ্চল আপনি হবেন না। আপনি এ সেল থেকে সরে আসুন, আজই আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি দশ নম্বর ওয়ার্ডে যেটা পলিটিক্যাল ওয়ার্ড ছিল। ওই ওয়ার্ডে আপনাকে যেতেও হবে, এখানকার পলিটিক্যাল ওয়ার্ড একেবারে উঠে গেল—গিয়ে এ, বি, ক্লাসের ওয়ার্ড হল। প্রিজনারস্-ও সব এসে পড়বে দু'চার দিনের ভেতর।

সুরেশ তাড়াতাড়ি কহিল, আজই—এখুনিই। ওর সান্নিধ্য আমার সহ্য হচ্ছে না,—আমায় বাঁচান জেলারবাবু।

দিন কয়েকের মধ্যেই ওই অস্বাভাবিক আবহাওয়াটা কতকটা যেন সহজ হইয়া উঠিল।

নরু সেই জীবন মরণের সন্ধিস্থলে। তিল তিল করিয়া যে-ক্ষয়, সে-ক্ষয় মানুষের চোখে পড়ে না; কাজেই সংবাদটা জেলময় রোজই একরূপ প্রচার হয় যে, সে সেই রকমই আছে।

এখানকার অধিবাসীগুলি তাহার প্রতি একটা দেবত্ব আরোপ করিয়া অনেকটা সুস্থ হইয়াছে—বুকের ভার, উৎকণ্ঠা যেন অনেকটা কমিয়াছে।

সুরেশ দশ নম্বরে বসিয়া সে কথাই কহিতেছিল, দশ নম্বর তখন গুলজার। বাঁড়ুজ্জে, চাটুজ্জে, মুখুজ্জে, ঘোষ, বোস, রায় প্রভৃতি কুলীন-কয়েদীতে ঘরখান একমত বোঝাই হইয়া গেছে। সুরেশ কহিতেছিল অমর রায়কে,—ওরা এতে উৎকণ্ঠা থেকে বেঁচে গেছে অমরবাবু। ওদের জীবনের দৈন্য, হীনতা ঢাকা পড়েছে। ওই ছেলেটিকে মানুষ ভাবলে কি নিজেদের মানুষ ভাবতে পারা যায়? যায় না। তাই সত্য-মানুষের যখনই যে-যুগে বিকাশ হয়েছে, তখনই সমাজ তাকে দেবত্ব দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। নিজের কাছে লজ্জার চেয়ে বড় লজ্জা আর কিছু নেই রায়; সে একটা প্রচণ্ড দাহ, তাতে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

অমর রায় কহিল,—তা হ'লে তুমিও পাপ-পুণ্যে বিশ্বাস কর সুরেশবাবু?

সুরেশ কহিল,—ধারণা ছিল বিশ্বাস করি না, মনে মনে ভাবতাম আমি আগামী যুগের মানুষ,—যে-যুগে মানুষের সেন্টিমেণ্ট বলে কিছু থাকবে না। প্রথম দিনই কি ভেবেছিলাম বা ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম জান? ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম he is a fool.

তারপর আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আজ কিন্তু তা ভাবতে পারছি না। আজ মনে হচ্ছে, বর্বরতার যুগে যখন মানুষ

আপনাকে ছাড়া চিনত না, অবলীলাক্রমে হত্যা করে এক টুকরা ফল বা মাংস কেড়ে নিত, সেদিনও মানুষ এই ধর্মে মুগ্ধ হয়েছিল। নইলে লক্ষ লক্ষ বৎসর সাধনা করে এই আদর্শের দিকেই মানুষ চলে আসবে কেন! আরও একটা কথা কি জান? দুনিয়া যতই বস্তুতন্ত্রবাদী হয়ে উঠুক না কেন, ফুল লোপ পেয়ে শুধু ফলে তার বুক ভরে উঠবে না,—উঠতে পারে না।

ওপাশে বসিয়াছিল গিরীশ চাটুজ্জে, সে বলিয়া উঠিল,—তুমি বড় আবোল তাবোল বক সুরেশবাবু, কি সব ভগবান মানি না—পাপ পুণ্য মানি না—

রায় কহিল,—তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর না কি চাটুজ্জে?

চাটুজ্জে যেন ফাটিয়া পড়িল,—মানি না? ভগবান মানি না? নাস্তিক কোথাকার! জান, পুলিসের সাব-ইনস্পেক্টারী করেও কখনও ত্রিসন্ধ্যা না করে জল খাইনি, মহামায়াকে প্রণাম না করে কোন কাজ করিনি? মায়ের পুষ্প পকেটে নিয়ে যেখানে গিয়েছি সেই খানেই সাক্‌সেস্!

রায় হাসিয়া উঠিল।

চাটুজ্জে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল,—এ দম্ভ থাকবে না, রক্তের তেজ কমবে, মহামায়াকে অবহেলা—

রায় কহিল,—বিন্দুমাত্র অবহেলা আমরা করিনি চাটুজ্জে। তোমার মা মহামায়া চিরজীবিনী হোন, তাঁর ভক্তের সংখ্যা মা ষষ্ঠীর কৃপায় সংখ্যাতীত হোক।

চাটুজ্জে আর দাঁড়াইল না। ভয়ানক রাগিয়া গালাগালি দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল।

সুরেশ ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—লোকটার মধ্যে পাপেরও একটা বিপুল নির্ভীকতা আছে। আমাদেরও আছে কিন্তু তার ভিত্তি হল যুক্তি তর্কের ওপর; আর ওর সংস্কার, সহজাত—হয়তো সহজাতই; এ

ওর টলবার নয়। এঞ্জিনীয়ারে গড়া structure ভূমিকম্পে চুর হয়ে যায়, ও কিন্তু পাহাড়!

অল্প কিছুক্ষণ নীরবতার পর সহসা রায় কহিল,—বাড়িতে তোমার স্ত্রী আছেন সুরেশবাবু?

সুরেশ তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল,—হ্যাঁ আছে। কেন বল তো?

—তুমি তাঁকে চিঠিপত্র লেখ?

—লিখি।

—বেশ আবেগ-দিয়ে-ভরা প্রেমপত্র?

—না, তা পারি না। কেন পারি না জান? বোধ হয় এই জেল হওয়ার জন্যে কেমন একটা প্রচ্ছন্ন লজ্জা আছে আমার। স্ত্রীর কাছে মানুষ খাটো হতে চায় না। যত সবল যুক্তিই আমার কর্মের পেছনে থাক না রায়, তার সংস্কারের কাছে ঠেকে সে সব চুরমার হয়ে যায়। আমি বেশ অনুভব করি অমরবাবু, আমার কৃতকর্মের জন্যে তার লজ্জার আর অবধি নাই। ঐ লজ্জার জন্যেই আমিও তার কাছে লজ্জা পাই।

অমর রায় কহিল,—চাটুজ্জে কিন্তু বেশ বড় বড় প্রেমপত্র লেখে—দু' তিন পাতা। শুধু প্রেমপত্র নয়,—এই খানে আবদ্ধ থেকেও লোকটা আপনার বিষয়-সম্পত্তি বেশ নিপুণ ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। কোন্ খাতকের নামে নালিশ করতে হবে, কার কোন্ জমিটা নিতে হবে—এ সব ওর নখদর্পণে। আর সেই সমস্ত হুকুম ও চিঠি মারফত পাঠিয়ে থাকে।

সুরেশ কথা কহিল না। অমরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা আবার কহিল,—আমার বিয়ে হয়নি সুরেশবাবু!

সুরেশবাবু কহিল,—নিশ্চিন্ত আজ রায়—দুর্ভাগ্যের মধ্যেও সৌভাগ্য।

অমর তাহার কথা কাড়িয়া লইয়া কহিল,—না, আমার মনে হয়

সে আমার দুর্ভাগ্য! জান সুরেশবাবু, এক এক সময় একটি নারীর মুখ কল্পনা করবার জন্য অন্তরাত্মা লালায়িত হয়ে ওঠে।

ঠিক সেই সময়ে চাটুজ্জে আবার আসিয়া টেবিলে একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া কহিল,—ভগবানকে—মা মহামায়াকে না মানবার তোমাদের কারণ কি? কেন—

অমর রায় সবল মুষ্টিতে চাটুজ্জের কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল,—Shut up you devil. Get out, get out. সেই সঙ্গে অঙ্গুলি সংকেতে বাহিরের রাস্তাটাও দেখাইয়া দিল।

অমরের চোখ দুইটা দপদপ করিয়া জ্বলিতেছিল। সুরেশ চট্ করিয়া রায়কে ধরিয়া বসাইয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিল,—বোস বোস অমরবাবু, আপনাকে হারিয়ে ফেলো না,—আপনাকে হারিয়ে ফেলো না!

চাটুজ্জের মুখ দেখিয়াই বোঝা গেল, সে রীতিমত ভয় পাইয়া গিয়াছে। রায়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবামাত্র একটু দূরে সরিয়া গিয়া মুখ ভেঙচাইয়া কহিল,—ওঃ, ভগবানকে তুই না মানলি তো আমার ভারী বয়েই গেল!

অল্পদূর গিয়া চাটুজ্জে আবার ফিরিল। এবার সুরেশের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া একেবারে আকর্ণ দন্ত বিস্তার করিয়া কহিল,—তুমি বেশ লোক মাইরি সুরেশবাবু, তোমাকে আমি ভালবাসি—

সহসা ভালবাসাটার হেতু না পাইয়া সুরেশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। চাটুজ্জে আবার হাসিতে হাসিতে কহিল, আমার বউ-এর চিঠি দেখবে সুরেশবাবু?

সুরেশ কহিল,—না।

চাটুজ্জে ব্যগ্রভাবে তাহার হাত দুইটা ধরিয়া কহিল,—না মাইরি, তোমাকে দেখতেই হবে, কালীর দিব্যি রইল।

সুরেশ বিরক্তভাবে কহিল,—আচ্ছা দেখব'খন।

চাটুজ্জে আবার কহিল,—তোমার চিঠি 'ডিউ' হয়নি সুরেশবাবু?

—আমি বড় একটা চিঠি লিখি না চাটুজ্জে, দু'মাস তিনমাস অন্তর একখানা।

—এবার তাহলে তোমার পাওনা চিঠিখানা আমায় লিখতে দেবে সুরেশবাবু? বউকে একটা চিঠি দেওয়া আমার বড্ড দরকার।

সুরেশ বিস্মিত ভাবে কহিল,—তা কেমন করে হয় চাটুজ্জে? তুমি তোমার বউকে চিঠি লিখবে—সে আমার নাম দিয়ে কেমন করে হবে? তলায় তো আমার নাম দিতে হবে!

সুরেশের জানুতে সোৎসাহে একটা চাপড় মারিয়া, সঙ্গে সঙ্গে একটা অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়া চাটুজ্জে কহিল,—তলায় লিখে দেব শুধু—'তোমার স্বামী'।

অমর উঠিয়া চাটুজ্জের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল,—আমি দেব এস।

সঙ্গে সঙ্গে চাটুজ্জে উঠিয়া পড়িয়া কহিল,—তাহলে তোমার খানাও দরকার হলে নেব কিন্তু সুরেশবাবু।

সমস্ত দিনে আর রায়কে দেখা গেল না। সুরেশ একা একা বসিয়া কত কথাই ভাবিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া ওই রুগ্ন ছেলেটির কথাই আসিয়া পড়ে। তাহার ধারণা ছিল সংস্কারকে সে জয় করিয়াছে, কিন্তু ননীর মত দেহ ঐ কিশোরটি তাহার সমস্ত শক্তি যেন চূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

ছেলেটার যদি পরাজয় হয়,—কোন রকমে যদি সে আহার গ্রহণ করে, তবে যেন শান্তি-সোয়াস্তি সে পায়। কতক কল্পনাও সঙ্গে সঙ্গে সে করিয়া যায়,—এই দারুণ রৌদ্র, আজ ক্ষীণ কণ্ঠে সে নিশ্চয় কহিবে—একটু জল! আর সে ক্ষীণ কণ্ঠের ধ্বনি দুন্দুভির মত এই বিরাট পুরীর পাষাণে পাষাণে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

কিন্তু তাহাতেও সুখ নাই, চিন্তার তীব্রতায় সমস্ত প্রাণটা যেন হাঁপাইয়া উঠে !

সুরেশ বারান্দাময় সঙ্গীর সন্ধানে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার নিজের স্থানটিতেই আসিয়া বসিয়া পড়িল।

বিনাশ্রম কারাদণ্ড আজ যেন তাহার পক্ষে অভিশাপ হইয়া উঠিয়াছে। পরিষ্কার আকাশ প্রদীপ্ত প্রখর সূর্যের আলোকে যেন জ্বালাময়, আকাশ পানেও তাকাইয়া থাকিতে পারা যায় না। ঘরখানির প্রতি খুঁটিনাটি দেখিয়া দেখিয়া দৃষ্টি যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সুরেশ গামছাখানা ঘাড়ে করিয়া অগত্যা পাইখানার পানেই চলিল ; সেখানে সেই-যে ময়রাটা মেথরের কাজ করে, তার সঙ্গে তো কয়টা কথা কওয়া চলিবে !

লোকটি বেশ ! অতীতের অভিজ্ঞতায় সে আপনার ভবিষ্যৎটা বেশ আঁচিয়া লইয়াছে। জেলে তাহাকে আবারও আসিতে হইবে—হয়তো জীবনটাই কাটাইতে হইবে, তাই নিজে যাচিয়া মেথরের কাজটা গ্রহণ করিয়াছে। কাজটা হালকা, তাড়া নাই বরং তোষামোদ পাওয়া যায়, আবার আহারও পাওয়া যায় ভাল।

খুশীর সময় সে অশ্লীল গানের বইখানা পড়ে, আবার মন খারাপ হইলে ছেঁড়া ব্যাকরণ কৌমুদীখানা খুলিয়া বসে।

সুরেশ আসিয়া কহিল,—কি হচ্ছে ? বই পড়ছ না আজ ?

লোকটি পা দুইটা ছড়াইয়া, বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—জেলের পাঁচিলগুলো কি উঁচু আর কি শক্ত ! আচ্ছা পাকা গাঁথুনি !

রায়কে দেখা গেল চারিটার পর—

বারান্দার ধারে সম্মুখের পানে চাহিয়া শূন্যমনে দাঁড়াইয়াছিল, সুরেশ ডাকিল,—এস রায়—এস এস।

রায় আসিয়া বসিয়াই কহিল,—ও-বেলার কথাটাই মনের মধ্যে ঘুরছে সুরেশবাবু, তুমি আমায় ঘেন্না করছ বোধহয় ?

সুরেশ কহিল,—ঘেন্না কেন করব অমরবাবু ?

—আমার স্বরূপ দেখে—আমার রক্ত মাংসের বুভুক্ষার তীব্রতা দেখে ?

—না, রক্ত-মাংসের মানুষের ওটা জন্মগত প্রবৃত্তি—তার বিকাশ মানুষের জীবনে তো স্বাভাবিক !

—তারও মাত্রা আছে সুরেশবাবু, কিন্তু আমার এ-যে কি তীব্রতা তা তোমায় প্রকাশ করতে পারি না। এর জন্যে আমার শাস্তি হয়েছে জেলে এসেও,—আমার টিকিটে লেখা আছে, তোমায় দেখাব।

সুরেশ কথাটার গতি ফিরাইতে কহিল,—তুমি কতদিন জেলে আছ রায় ?

—চার বছর।

সুরেশের ইচ্ছা হইল অপরাধের কথাটা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু পারিল না। রায় আপনা হইতেই কহিল,—কি করেছিলাম জিজ্ঞাসা করলে না সুরেশবাবু ?

সুরেশ লজ্জিত হইয়া কহিল,— সে ঠিক নয়।

রায় কহিল,—সবাই কিন্তু করে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার রায় কহিল,—তুমি বোধহয় বেশী দিন জেলে আস নাই, না ?

—না, এই মাস চারেক হল।

—তাই, তাই তোমার জীবনটা আজও সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়নি।

—তা নয় রায়, আমার জীবনে আমি কখনও কোন আবরণ রাখিনি কিন্তু হঠাৎ আজ আমি আপনাকে যেন হারিয়ে ফেলেছি।

অমর কি যেন ভাবিতেছিল, কথাটা বোধহয় সে শোনে নাই। সহসা কহিল,—বিনা অপরাধে শাস্তি হয়, এ তুমি বিশ্বাস কর সুরেশবাবু ?

সুরেশ অন্যমনস্ক ভাবেই সায় দিল,—করি।

আবার একটু নীরবতার পর রায় কহিল,—আমার বিনা অপরাধেই শাস্তি হয়েছে সুরেশবাবু! কণ্ঠস্বরে তাহার একটা বিষাদক্লিষ্ট গাম্ভীর্য, সে স্বর মানুষের মনের এমন একটি তারে ঘা দেয় যে, মানুষ তাহা উপেক্ষা করিতে পারে না। সুরেশ মুখ তুলিয়া চাহিল।

রায় যেন আর সে মানুষটিই নয়; ভঙ্গিমায়, স্বরে সহসা তাহার ভিতর যেন একটা আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। স্তিমিত চোখের বিষণ্ন-দৃষ্টি দূরে-সুদূরে ওই আকাশের বুকে নিবদ্ধ, যেন অতীতের কি একটা স্মৃতি তার চোখের ওপর সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রায় কহিল,—ওই নরু ছেলেটির শিক্ষা দীক্ষা কল্পনা করতে পার, —ওই ধারারই আর একটি ছেলে, একটা বিরাট মনুষ্যত্বের আদর্শ সম্মুখে রেখে জীবনপথে চলা শুরু করেছিল। সমিতির পর সমিতি গড়ে উঠেছে তাকে কেন্দ্র করে, মহামারীকে সে দু'হাতে ঠেলে তার পল্লী থেকে বের করে দিয়েছে, দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, আগুন, জল, যখন যে সংহার-মূর্তিতে মানুষকে আক্রমণ করেছে, তারই সঙ্গে বুক দিয়ে অমিতবীর্যে সে লড়াই করেছে।

গায়ের জামাটা তুলিয়া পিঠটা দেখাইয়া বলিল—দেখছ সুরেশ-বাবু, প্রায় সমস্ত পিঠটা জুড়িয়া একটা মস্ত ক্ষত-চিহ্ন।

—আগুন একবার তার জীবনকে গ্রাস করতে এসেছিল। জ্বলন্ত ঘরে একটি মেয়ে,—তাকে বাঁচাতে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল সে, মুখের আহার কেড়ে নেওয়ার ভয়ে ক্রুদ্ধ অগ্নি-শিখা সহস্র হস্ত বাড়িয়ে তাকে আক্রমণ করল। বেরুবার মুখে জ্বলন্ত দরজাখানা তার পিঠের ওপর চেপে পড়ল। কিন্তু এত অমৃত জীবনে তার সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল সুরেশবাবু যে, তার জীবনের কণামাত্র পেয়ে আগুনের তৃপ্তি হয়ে গেল। সে বোধহয় বলতে পারতো সুরেশবাবু; অন্তত তার নিজের পল্লীখানিকে দেখিয়ে বলতে পারত—"আমার

জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ।" রায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইল।

কিছুক্ষণ পরে আবার কহিল,—একটা জিনিস সে জানতো না,—জানতো না যে, মনুষ্যত্বের বিকাশে মানুষের এত প্রচণ্ড হিংসা হয় যে, মানুষ মানুষকে হত্যা করতে পারে। জমিদারের সে কোন অনিষ্ট করেনি, সে কমিউনিস্ট ছিল না সুরেশবাবু, তার ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করেনি, তবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল। এক দরিদ্র বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনের অবলম্বন সামান্য কিছু সম্পত্তি—

এইখানে রায় একটু হাসিয়া কহিল,—কিন্তু, "বাবু কহিলেন, বুঝেছ উপেন, ও জমি লইব কিনে।" স্বামীর সম্পত্তি বিধবা ছাড়তে রাজী হল না, শেষে জোর করে জমিদার তা কেড়ে নিলে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছেলেটি স্বেচ্ছায় মাথা তুলে দাঁড়াল। সম্পত্তি অবশ্য ফেরাতে পারল না;—ফেরাতে পারল না নয়, সম্পত্তি ফিরত, কিন্তু তার আগেই জমিদার টাকা দিয়ে মেয়েটাকে কিনে ফেললে সুরেশবাবু! যে মেয়ে খানিকটা মাটি দিতে চায়নি, সে শেষে তার দেহ পর্যন্ত তাকে বিক্রী করলে। থাক, টাকা দিতে হল জমিদারকে। তারপর হল কি জান? সংবাদ রটল, সেই টাকা নাকি সেই ছেলেটি ডাকাতি করে লুঠে নিয়েছে, তার মর্যাদাও নাকি হরণ করেছে; মেয়েটি তাকে নাকি খুব ভাল করে চিনতে পেরেছিল। আদালতেও সেই সাক্ষীই সে দিয়ে এল! ছেলেটির সাজা হল পাঁচ বৎসর জেল আর বিশ-ঘা বেত। সুরেশবাবু, পিঠে যে দাগ দেখলে, উলঙ্গ হলে দেখতে ওই বেতের দাগও ঠিক এমনি অক্ষয় হয়ে গিয়েছে।

রায় নীরব হইল। সুরেশ রায়ের কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিল। তার মন যেন আরও স্তিমিত হইয়া গেল, একটা উত্তর, একটা সহানুভূতির কথা বলিবার ভাষাও যেন সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না; শুধু নীরবে সম্মুখের পানে উদাস নেত্রে চাহিয়া রহিল। দূরে আকাশের গা বাহিয়া

সন্ধ্যার অন্ধকার সরীসৃপের মত আগাইয়া আসিতেছে, পাখিগুলার কলরব তখনও শেষ হয় নাই, একটা পেঁচা কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে ডাকিয়া উঠিতেছে—চ্যাঁ—চ্যাঁ—

বারান্দার ওদিক হইতে চাটুজ্জের সাড়া পাওয়া গেল।

—রায়—রায়, এই শালা, অন্ধকার হয়ে এল-যে, ঘর বন্ধ হয়ে যাবে যে—আরে এই—

রায় উঠিয়া পড়িয়া সুরেশকে কহিল,—মন কি তোমার খারাপ হয়েছে সুরেশবাবু?

সুরেশ কহিল,—হ্যাঁ—কেমন এক রকম—যেন,—

রায় কহিল,—আসবে আমার সঙ্গে?

—কোথায়?

—গাঁজা খাবে! ওই দেখ চাটুজ্জে ডাকছে। রাত্রে বেদম ঘুম হবে। আমরা রোজ খাই—ওই শালা আমাকে শিখিয়েছে।

সুরেশের বিস্ময়ের এবার আর অবধি রহিল না, সে রায়ের মুখপানে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কথাটা যেন সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

রায় হাসিয়া কহিল,—তুমি কি আমাকে সেই ছেলেটি ভাবছ না-কি? He is dead—সে মরে গেছে সুরেশবাবু, সে মরে গেছে।

সুরেশ কহিল,—মাপ কর অমরবাবু, মরালিটি আমি মানিনে কিন্তু নেশাও করিনে। জিনিসটাকে আমি ঘেন্না করি।

রায় চলিয়া গেল।

মিনিট বিশেক পরে আবার রায় আসিয়া কহিল,—চাটুজ্জে-শালা বেড়ে লোক মাইরি। সিগ্রেটের ভিতর মাল পুরে—হি-হি-হি—

সে হাসি আর ফুরায়ই না।

সুরেশের বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এ হাসি যে-কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে, সেই-কণ্ঠ হইতেই একটু পূর্বেকার সেই স্বর বাহির হইয়াছিল।

সে হাসি থামিলে কিছুক্ষণ সব নীরব। আবার হঠাৎ রায় কহিল,—আচ্ছা,—বি ইউ টি—বাট্ হলে পি ইউ টি—পাট্ হবে না কেন সুরেশবাবু? হি-হি-হি—

ওদিকে ঢং ঢং করিয়া ছ'টা ঘড়ি বাজিয়া গেল। বাহিরে তালার পর তালা বন্ধ হইতেছিল। মাঝে মাঝে হাঁক আসিতেছিল,—সরকার—

— সেলাম।

রায় উঠিয়া আপনার ঘরে যাইতে যাইতে আবার কহিয়া গেল,—বি ইউ টি বাট হলে পি ইউ টি পাট হবে না কেন?

সুরেশ তাহারই পানে চাহিয়াছিল, সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—'বি ইউ টি বাট হলে পি ইউ টি পাট হবে না কেন'! খেলে মন্দ হয় না।

আট

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়া যাইতেছে—সুরেশের ঘুম আসে না, বিনিদ্র চোখে বিছানায় ছটফট করিতেছে।

বাহিরে রাত্রিটা জ্যোৎস্নাময়! দূরে কোন দরিদ্র-পল্লীতে মাদল, কাঁসি বাজিতেছে, একটা পরিপূর্ণ আনন্দের আমেজে বাতাসও যেন উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। এদিক দিয়া কোন কামারশালার একঘেয়ে ঠং ঠং শব্দ সময়ের সমতা রাখিয়া বেশ বাজিয়া চলিয়াছে। শব্দটা সুরেশের বেশ লাগিল। ঠং করিয়া ধ্বনিটা উঠিয়া দিগ-দিগন্তরে ছড়াইয়া ক্ষীণ হইয়া আসিতে আসিতে, আবার ধ্বনিয়া উঠে—ঠং, একটি সুন্দর সংগীতের রেশ ওর মধ্যে আছে।

মধ্য রাত্রে ভারী বুটের আওয়াজ যেন বাড়িয়া গেল, ত্রস্তভাবে যেন সব চলা ফেরা চলিতেছে। বড় ফটকটা খোলারও শব্দ পাওয়া গেল।

সুরেশ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

এদিক ওদিক ফিরিয়া কোন কিছু নির্ণয় করিতে না পারিয়া সে আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল। জ্যোৎস্নার ঝলক জাল-আঁটা জানালা দিয়া সিক ও জালের ছায়া ফেলিয়া মার্বেলের জাফরির মত দেওয়ালের গায় মূৰ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। ওদিকে তখনও সেই কামারশালের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে—ঠং ঠং।

সহসা সুরেশের মনে হইল, নরু বোধ হয় আহার গ্রহণে সম্মত হইয়াছে!

উৎসাহে উঠিয়া বসিয়া বিছানার উপর একটা চাপড় মারিয়া সে কহিল,—Fool, he was a fool.

তারপর একটা স্বস্তির আনন্দে অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

—ঢং, ঢং, ঢং, ঢং, ঢং।

ভোর পাঁচটার ঘড়ি পেটা শেষ হইয়া গেল; কয়েদীরা সব জাগিয়া সারিবন্দী বসিয়া গেল,—এখনি দরজা খুলিবে।

কিন্তু দরজা খুলিল ছয়টার সময়—এক ঘণ্টা পর।

হেড-ওয়ার্ডার কয়েদী গণনা করিয়া বলিয়া গেল,—আজ ছুটি হ্যায়। বাহারসে মু-হাত ধোকর—ঘরমে ঘুস্ যাও।

বাহিরে আসিয়াই সকলের সেদিন বুক কাঁপিয়া উঠিল। সশস্ত্র প্রহরীগুলি সব স্তব্ধ গাম্ভীর্যে পেট্রোল করিয়া ফিরিতেছে,—সমস্ত জেলখানাটা যেন একটা ধূমায়মান আগ্নেয়গিরি।

কেষ্ট ফিসফিস করিয়া পাশের কয়েদীটাকে জিজ্ঞাসা করিল,—কি ব্যাপার বল দেখি?

—সেই কামার বেটা বোধ হয়—

সিপাই হাঁকিয়া উঠিল,—চোপ!

পায়খানার দিকে যাইতে যাইতে গোসাঁই নাকে হাত দিয়া শুঁকিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল,—জারমানী কলকাতার ধার পর্যন্ত এসে পড়েছে, শ্বাসা শুণে বুঝতে পারছি।

একটা অপ্রত্যাশিত আশায় ও আনন্দে সকলের চোখ যেন জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল! গোসাঁই আবার একবার নাকে হাত দিয়া কহিল,—হুঁ,—বাঁ-নাকে শ্বাসা বইছে, ঠিক।

সারিবন্দী পায়খানার ধারে বাঁধান জায়গাটায় অভ্যস্ত ভাবে সকলে বসিয়াছিল। গোর ছেলেটাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল,—কি রে—এ সব কি? তুইতো সব জায়গায় যাস।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,—পাঁচ নম্বরের সেই বাবুটি—

বেচারী আর বলিতে পারিল না। বাহিরে একটা কলরোল উঠিতে ছিল,—সেই দিকে অঙ্গুলী নির্দেশে ইঙ্গিত করিয়া কহিল—ওই শোন্।

বাহিরে সে কি কলরোল!

মরণের রথে-জীবনের-জয়যাত্রায় মানুষের উল্লাস-কলরোল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

মরণ-ভীরু মানুষ দলে দলে কলরোল করিয়া এই শবের জ্ঞাতিত্ব দাবি করিতেছে; —মুহূর্তের জন্য ওরাও যেন আজ মরণ জয় করিয়াছে।

কয়েদীর দল চঞ্চল হইয়া উঠিল—মনে হইল, ঘাড় উঁচু করিয়া ওরাও বাহিরের ওই জীবনোচ্ছ্বাস একবার দেখিয়া লয়, কিন্তু সম্মুখে বিশাল প্রাচীর-বেষ্টনী!

দুর্যোগের রাত্রে প্রান্তরে পথহারা যাত্রিদল—দূর গ্রামের জীবনের সাড়ায় উদগ্রীব উত্তেজনায় যেমন বলে,—কোথায়, কোথায়, তোমরা কোথায়? তেমনি একটা উন্মাদ কোলাহল যেন বাহিরের জগৎটাকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে বাঁশির পর বাঁশির তীক্ষ্ণ শব্দে সমগ্র জেলখানাটা রোষে চিৎকার করিয়া উঠিল,—গুমটিতে 'পাগলা ঘন্টি' বাজিয়া গেল—ঢনঢন ঢনঢন—

জীবন-সন্ধানী ব্যাকুল যাত্রিদলের সম্মুখে দুর্যোগের আকাশে যেন বাজ গর্জিয়া গেল।

• জীবনের স্বাভাবিক চলমান স্রোতে বাধা পড়িয়া যে-আবর্তের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে খড়কুটার মত পাক খাইয়া খাইয়া বন্দিশালার অভাগা মানুষগুলি যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। একটা অতি চঞ্চল

হাসির সংঘাতে ওই আবর্তে একটা স্বাভাবিক প্রবাহ আসিতে পারে—এটা সবাই জানে ; কিন্তু কারোই যেন হাসি আসে না। সময়ে সুযোগে ওই কথা, ওই ছেলেটিরই কথা আসিয়া পড়ে।

ঝড়ের মত অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া এই অদ্ভুত ছেলেটি যেন বন্দিশালায় একটা বিপর্যয় ঘটাইয়া দিয়া আবার অকস্মাৎই কোথায় মিলাইয়া গেছে !

মাঝে মাঝে কৌতুক উঠিতে উঠিতে মিলাইয়া যায়। বুড়ো মাঝীটা অতিষ্ঠ হইয়া সেদিন গৌরকে কহিল,—

দূ-রো মোড়ল এটা হলো কি ?

—কি হল বল দেখি ?

—ও মল তো আমাদের কি ?

ওর ক্ষুদ্র জীবনও যেন এ ক'দিনেই বিষণ্ণতার চাপে পড়িয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছে।

গৌর কথাটার প্রতিবাদ করিতে পারিল না। মানুষের মরণজয়ে যে-আশ্বাস মানুষ পাইয়াছিল, সে-আশ্বাস দুর্বল-মানুষ এই কয়দিনেই হারাইয়া আবার নিঃসম্বল হইয়াছে। কি লইয়া আজ সে বাঁচিয়া থাকিবে, পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে মরণ যে নিশ্চিত পদক্ষেপে আগাইয়া আসিতেছে— কোন অবলম্বনে তাহার পানে নিরন্তর পথ-চাওয়া সে ভুলিয়া থাকিবে !

মাঝী কহিল,—আজ আমি গায়েন করব মোড়ল।

গৌর সহসা সকলকে ডাকিয়া দুইটা হাত নাড়িয়া কহিল,—চোপ, চোপ, আজ মাঝী গান করবে,—সাঁওতাল নাচ হবে আজ।

সবাই যেন এই চাহিতেছিল। সব সরিয়া সরিয়া বসিয়া গেল—মাঝী দুই হাতে দুইখানা থালা লইয়া বাজাইতে বাজাইতে গান ধরিল : তাহার অর্থ এই—

কালো মেয়েটি চলিয়া যায়, মাথায় তাহার জবাফুলের গোছা,

জবার শিষ কয়টি ওর দেহের দোলার সঙ্গে হেলিতেছে, দুলিতেছে : ওই তালে তালে তোরাও পারিস তো নাচ।

গান শেষে থালা বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে বাজনার বোলটাও মুখে আওড়াইয়া গেল—

চিলাক চিলাক,চিলাক—দিপং, চিলাক—দিপং, হুরুর্—হুরুর্—হুরুর্—

গানখানির ভাবের সহিত ওর মনের কোন সম্বন্ধ নাই হয়তো, কিন্তু সুরের সহিত নাচের একটা সুষম সংগতি আছে ; সে নাচে শিল্পও আছে—নৈপুণ্যও আছে !

বাহিরে নূতন বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণ-পক্ষের রাত্রি—নিবিড় অন্ধকার, জানালার বাহিরে সমস্ত পৃথিবীটা যেন হারাইয়া গেছে ; ভিতরে স্বল্প আলোকে কতগুলি প্রাণী বাঁচিবার চেষ্টায় এমনি প্রাণপণ করিয়া আনন্দ সঞ্চয় করিতেছিল।

অমর রায় আপনার তার-ঘেরা জানালাটা দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল।

বাহিরে মৃদু বারিপাত হইতেছে—তার শব্দ বড় শোনা যায় না। বর্ষাভিষিক্ত গাছগুলির পাতা-ঝরা জল অনিবার টুপটুপ শব্দ করিয়া পড়িতেছে। ওর চোখে সব চেয়ে আজ সুন্দর লাগিতেছে জোনাকির মেলা ! গাছে গাছে অসংখ্য অজস্র জোনাকি মুহুর্মুহু বিকশিত হইয়া গভীর কালোর বুকে আকাশ-জোড়া তারা-ফুলের আতস বাজি জ্বালাইয়াছে। এক নেভে, এক জ্বলে, এ-গাছ হইতে ও-গাছে আনাগোনা করে !—

অমর এর বিজ্ঞানসম্মত অর্থ জানে।—এ হইতেছে ওদের নারী পুরুষের পরস্পরের প্রতি অভিসারের আহ্বান। এ ওকে ডাকে,ও একে

ডাকে। যে-গুলো চলাফেরা করে সেগুলো পুরুষ। কিন্তু এ অর্থে রায়ের আজ মন উঠিল না—কালো অন্ধকারের বুকে আলোর ফুল ফোটার যে সৌন্দর্য, তাই যেন আজ তার বুকে বাসা গাড়িয়াছে; চোখে তার রূপের অঞ্জন লাগিয়াছে। রায়ের মনে পড়িল সে কবিতা লিখিতে পারিত; আজ আবার তাহার সাধ হইল কবিতা লেখে। সে একটা সিগারেট ধরাইয়া মনে মনে কবিতা রচনার চেষ্টা করিল।

দূর হইতে সেই কামারশালার উত্তপ্ত লোহার অবিশ্রাম ঠং ঠাং শব্দ নিরন্ধ্র অন্ধকারের গা বাহিয়া দিকে-দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। রায় বেশ বোধ করিল শব্দটা নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে না—দূরে দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে মাত্র।

এই দৃশ্যবৈচিত্র্য ও অনুভূতির মাঝে কতক্ষণ কাটিয়া গেল খেয়াল ছিল না, সহসা তাহার মনে হইল কে যেন বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে। সে কান্নায় উচ্ছ্বাস নাই, আবেগ নাই, ভাষা নাই, শোনা যায় শুধু—ধ্বনিতে বিলাপ।

কয়েক মিনিট পরই পাশের ঘরে চাটুজ্জে বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিল,—আঃ, জ্বালালে শালা কামার; শালাকে তো লটকে দিলেই হয়!

অমর জানালায় মুখ রাখিয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিল,—চাটুজ্জে!

চাটুজ্জে বেশ আমিরী কণ্ঠে কহিল,—কে অমরবাবু নাকি? দিলে শালা কামার ঘুমটা চটিয়ে, তুমি বুঝি পেত্নী মনে করেছ?

—ও কি সেই কামারটা?

—হ্যাঁ, শালা এখন আর বেমক্কা চেঁচায় না, রাত্রে এমনি ধারা কাঁদে! শালা পাপী হে!

ওয়ার্ডার সাড়া দিয়া উঠিল,—চুপ রহো বাবু, নিদ যাও—নিদ যাও।

চাটুজ্জে ভেঙচাইয়া কহিল,—লে—লে বাবা, বলে লে যত পারিস। কথায় আছে সেই-যে 'বে-কায়—দায় পড়লে হাতি, চামচিকিতে মারে

লাথি, নইলে আমি বাবা সাবইন্‌স্পেকটার--হুঃ! তারা—তারা, মা মহামায়া—

একবার নড়িয়া চড়িয়া শোওয়ার এক. শব্দ হইল, তারপর আর চাটুজ্জের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

অমর দাঁড়াইয়াই ছিল,—কবিতার এক লাইনও তার মাথায় আসিল না, কিন্তু সহসা মনে পড়িয়া গেল একটা বিখ্যাত কবিতার একটি পদ "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে"...

রায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল,—এ লোকটার জীবনের বেদনার গান-রচনা শুধু ওই বিলাপ--ওই কান্না; মানুষের ভাষা যেদিন হয়নি সেই-দিনের মানুষের কাব্য এ-ই; শ্রেষ্ঠ সত্য!

আরও দিন পনেরো পরে—ওদের জীবন তখন অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছে।

সে দিনটা রবিবার, কয়েদী দলের বিশ্রামের দিন। সেইদিন সকাল হইতে ওরা কামায়, কাপড় জামা সাফ করে, আপনার পরিচর্যার জন্য এই একটি দিন তাহাদের অবসর। এ দিনটা ওদের ছয় দিন ধরিয়া কামনা-করা দিন।

ছোঁড়াটার কিছু কাজ বাড়িয়াছে। ওকে এখন নাপিতের কাজ করিতে হয়। ছোঁড়াটা কাজ করিতেছিল, কেষ্টা আসিয়া পাশে মাটির উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। কেষ্টার শরীরটা একটু সারিয়াছে—দেখিলেই বোঝা যায় দেহ নীরোগ, সর্ব অবয়বে একটি মৃদু সজীবতা দেখা দিয়াছে।

ছোঁড়াটা কহিল,—আজ তোর চুল কাটব মাইরি।

কেষ্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—সাইদের ছেলেটা মারা গেছে রে, খবর এসেছে।

ছেলেটার হাতের মুখর কাঁচিখানা সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত থামিয়া গেল। সে অপলক নেত্রে কেষ্টর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কেষ্ট আবার কহিল,—সাপে খেয়ে মারা গেছে।

এ আকস্মিক দুঃসংবাদে উপস্থিত সব কয়টি লোকই যেন স্তম্ভিত, মূক হইয়া গেল।

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে ছেলেটা কহিল,—সাইদ কি করছে রে? খুব কাঁদছে?

—শুনেই ফিট হয়ে গিয়েছিল, তারপর জ্ঞান হলে উঠে বসে চোখের জলে বুক ভেসে গেল; মুখে কিন্তু চেঁচায়নি।

যে লোকটির চুল কাটিতেছিল সেও মাথায় দু'হাত দিয়া কি ভাবিতে-ছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ছেলেটি কহিল,—এস ভাই, তোমায় কামিয়েই আজ শেষ করে দেব, সাইদের কাছে যাব একবার।

চৈতনা বলিয়া উঠিল,—আমায় কামাতে হবে।

—তোকে ভাই বুধবার দিন দিয়ে দেব—নয় তো কাল; দশ নম্বরের জন্যে ক্ষুর কাঁচি সকালে আনতেই হবে!

চৈতনা কহিল,—না, আমার মাথা ভার হয়ে আছে, আমায় না দিলে আপিসে বলে দেব।

সেদিনের সেই ওস্তাদ বসিয়াছিল এ পাশে, সে কহিল,—বার পাঁচেক তোমার জেল ঘোরা হয়েছে, না চৈতনচরণ?

প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন বিষটুকু জ্বালা ধরাইয়াছিল, চৈতনা উষ্ণভাবে কহিল,—তোমার তো ভারী চওড়া চওড়া কথা হে।

ওস্তাদ উঠিয়া যাইতে যাইতে কহিল,—দোষ দিই নাই ভাই, এ জেলখানা, গম্-খানা—আপনা বাঁচানা।

চৈতনা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া যেন আঘাতের তীব্রতাটা অনুভব করিয়া লইল, তারপর গণেশকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—বটেই তো—'আপনা বাঁচানা' তো বটেই, উনি-ত ভারী আমার, ওঃ—

বলিয়া সে-ও উঠিয়া পড়িল।

কেষ্ট কহিল,—চুল কেটে যা, ও তো দেব না বলেনি

—না, আর চুলই কাটব না, চুল রেখে দেব এইবার।

একদল লোক সাইদকে ঘেরিয়া বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছে। ওস্তাদ ইতিপূর্বেই আসিয়াছে—চৈতনাও আসিয়া এক পাশে বসিয়া গেল, একটু সংকোচ ভরেই বসিল।

সাইদ হাঁটু দুইটাকে হাতের ছাদে ঘেরিয়া সেই অন্তরালে মুখ লুকাইয়া বসিয়াছিল। বুঝি কাঁদিতেছিল!

এত বড় একটা নিষ্ঠুর মৃত্যুর মর্মান্তিক সংবাদে সব যেন মূক হইয়া গিয়াছে—সান্ত্বনার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছে না—

চৈতনাই প্রথম কথা কহিল! বলিল,—সপ্পাঘাতে মিত্যু আহা-হা! ও কিন্তু সাইদের পাপেই হয়েছে, সপ্পাঘাতের মৃত্যু বেহ্মশাপ ভিন্ন হয় না! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার কহিল,—একেই বলে 'কে কল্লে বেহ্মহত্যে কার প্রাণ যায়,' আহা-হা নির্দোষ শিশু! কি বল গোসাঁইজী!

গোসাঁইজীর মনেও যেন শোকের আঁচ লাগিয়াছে। ওপাশে বসিয়া একটা বিড়ি টানিতে টানিতে গোসাঁইজী বাহিরের পানে শূন্য মনে তাকাইয়াছিল,—অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর করিল,—কৌন জানে-রে বাবা।

তারপর একটু নড়িয়া চড়িয়া আবার কহিল,—উস্‌কা নসীব—নিয়ত!

ওস্তাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—ছেলেটার নিয়তই হয়তো বটে—কিংবা হয়তো ব্রহ্মশাপেই সে মরেছে কিন্তু মনে হয় কি জান? মনে হয়, আমার যদি জেল না হত, আমি যদি তার তদ্বির করতে পেতাম, তবে হয়তো এমনটা হতে পারত না। আমার দুটো ছেলে

গিয়েছে,—একটা জ্বরে, একটা কলেরায়। ছেলে দু'টোর মুখ আর এখন মনে পড়ে না, তবু সময় সময় মনে হয়, এমনি করে আমাকে যদি জেলে না থাকতে হতো, আমি যদি তদ্বির করতে পেতাম, তবে হয়তো তারা, —কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে নীরব হইল।

সাইদ এবার মুখ তুলিল, চোখের জলে মুখখানা তাহার ভিজিয়া গেছে; কহিল,—সত্যি কথা ওস্তাদ, আমি যদি থাকতাম তবে এমন হত না, কক্ষনো হত না: সাত আট বছরের ছেলেকে আমি ঘাস কাটতে পাঠাতাম না, কেউই পাঠায় না। কিন্তু এ হয়েছিল পরের গলগ্রহ! মা করেছে নেকা—সে লোকের কোন দরদ? পরের ছেলের ওপর কেন থাকবে বল?

গৌর কহিল,—এমন পরিবারের গলায় পা দিয়ে আমি মারতাম। গৌরের মুখখানা ভীষণ হইয়া উঠিল—ও বেচারীও একটি শিশুকে একটি নারীর হাতে রাখিয়া আসিয়াছে।

সাইদ কহিল,—নাঃ, আর আমার সে ইচ্ছে হয় না। যখন তার নেকা করার খবর পেয়েছিলাম, তখন তাই ভাবতাম। রাতের পর রাত আমি ঘুমুইনি, শুধু কেমন করে পালান যায়, তাই ভেবেছি। এক টুকরো দড়ি, একটা লোহা সব জুগিয়েছি—পালাবার জন্যে। কালও রাতে তাই ভেবেছি আমি, কিন্তু আজ চিঠি পেয়ে সে ইচ্ছেই আর নেই। মনে হয় কি জান? সে তো মা, মা হয়ে সে যে-দুঃখে ছেলের কষ্ট দেখেও নেকা করেছে, সে দুঃখ তো কম দুঃখ নয়!,

কথাটার উত্তর কেহ দিতে পারিল না। বোধকরি এই দুঃখবোধের মুহূর্তে সকলেই সেই অসহায়া নারীটির অসহ দুঃখের পরিমাণ অন্তরে অন্তরে কতক অনুভব করিতে পারিল;—শত দুঃখ কষ্টের বিনিময়েও পুরুষের আনুগত্য লঙ্ঘন করার অপরাধে একটি নারীকে অপরাধিনী ভাবিতে আজ তাহাদের মন চাহিল না। নারী ও পুরুষের পার্থক্য পার হইয়া মানুষের একটা পৃথক সত্তা আছে—সে নারী নয়, পুরুষও

নয়,—সে শুধু মানুষ। সমস্ত বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অতীতকে লঙ্ঘন করিয়া শুধু ওই বেদনার মুহূর্তটিতে অপরাধীর দলও মানুষ—সত্য তখন তাহাদের দৃষ্টির সম্মুখে।

এই সময় ছেলেটা আসিয়া দাঁড়াইল,—পেছনে কেষ্ট। সাইদ তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিল,—আয়, বোস।

অনেক দিনের পর আজ সাইদ ছেলেটার সঙ্গে কথা কহিল। স্ত্রীর নেকার খবর যেদিন হইতে আসিয়াছে, সেদিন হইতে সে আর ছেলেটার সহিত কথা কহে নাই। ছেলেটা মুখ নামাইয়া বসিল।

সাইদ তাহার পানে চাহিয়া কহিল,—ওকি-রে তুই কাঁদছিস?

সত্যই ছেলেটা কাঁদিতেছিল।

জেলের ফটকে এগারোটার ঘড়ি বাজিয়া গেল। ওদিকে ঝনো ঝনো করিয়া কাপড়-চোপড় পরিষ্কারের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

চৈতন্য কহিল,—চল সব। ছ' নম্বরে আজ তেল দেবে।

একে একে সব উঠিতে শুরু করিল; ছেলেটা সাইদকে কহিল,—তোর কাপড়গুলো দে, কেচে দেব।

সাইদ ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল,—না চল, আমারও তো বিছানা পেড়ে শুয়ে থাকলে চলবে না,—গায়ে কাদা মাখলে যমে ছাড়ে না!

চলিতে চলিতে সাইদ কহিল,—আমার সব চেয়ে দুঃখ কি হচ্ছে জানিস? এক মুঠো মাটিও কবরে তার দিতে পেলাম না। একটু থামিয়া আবার কহিল,—কোন্ কষ্টটাই বা ছোট বলি! মনে হচ্ছে আমি থাকলে এমন হত না, সে এক কষ্ট;—আবার কবরে মাটি দিতে গেলাম না, সেই এক কষ্ট; যখন তার মায়ের কথা ভাবি তখন তারই তরে কষ্ট হয় বেশী—সে হয়তো প্রাণ খুলে কাঁদতেও পাচ্ছে না।

সম্মুখেই ছ'নম্বর ওয়ার্ড। তেল লইতে কয়েদীদলের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। চাপা কলরোল, তার মধ্যে একজন আবার থালা বাজাইয়া গান ধরিয়াছে—

"ও সে মুচকি হেসে গেল চলে কিছু না বলে,—
বল গো সখি পাব তারে কোন্ দেশে গেলে।"

খোলা দরজাটা দিয়া দেখা গেল—গাহিতেছে চৈতনা। শুধু গান নয় থালা বাজাইয়া কোমর ঘুরাইয়া নাচও জুড়িয়া দিয়াছে। গোসাঁই দাঁত মেলিয়া ঘন ঘন বাহবা দিতেছে।

সাইদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিতে চলিতে কহিল,—এখানে কি চোখের জল ফেলা যায়-রে! পরের দুঃখ দেখবার এখানে কারু ফুরসত নাই। একটু থামিয়া আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—নিজের দুঃখেরই শেষ নাই, তার ওপর পরের দুঃখের বোঝা আর কত বইবেই বা? আমিও এমন কত করেছি। যার যার দুঃখ তার কাছে। সমুখে যতক্ষণ, ততক্ষণই দুঃখ, তারপর বেরিয়ে এলেই যা ছিল তাই,—যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়।

উত্তরের প্রত্যাশায় পিছু ফিরিয়া দেখিল ছেলেটা অনেক পিছনে—ওই ওয়ার্ডটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাহাকে ডাকিতেছে।

কেষ্টা কহিতেছে,—যাই যাই, চল না তুই।

সাইদের কয়দিন ছুটি মিলিয়াছে।

চৈতনা অন্তরালে কহিল,—বেশ আরাম মেরে দিলে বাবা!

গণশা কহিল,—যা বলেছিস্ মাইরি।

পীড়িত-জীবনের ঈর্ষা এমনিই বটে; দুর্ভিক্ষ-পীড়িতা মা'ও সন্তানের মাংস খায়!

বন্দি-জীবনে ওই যে খানিকটা বিশ্রাম, বাধ্যতা-মুলক-পরিশ্রম লাঘবের দুটিদিন অবসর, ওরই ঈর্ষায় ওরা জর্জর হইয়া ওঠে।

জানালায় গরাদের ফাঁকে মুখ রাখিয়া সাইদ দাঁড়াইয়াছিল।

ছেলেটার মুখ এখন আর অহরহ ওর চোখের সম্মুখে নাচে না, তবু মনটা সর্বক্ষণ উদাস। চোখের জল শুকাইয়াছে, দীর্ঘশ্বাসগুলা এখন শুধু কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাহির হয়। একটা বিরাট শূন্যতা যেন তাহার বুকে বাসা বাঁধিয়াছে।

বাহিরে মোটরের হর্ন বাজিতেছিল। দশটার ঘড়ি বাজিয়া গিয়াছে, এগারোটা প্রায় বাজে, সাইদ বুঝিল,—সে কয়েদী গাড়ির হর্ন।

বিচারাধীন কয়েদীর দল ফটকটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এখনি ফটকটা খুলিবে, বাহিরটা একবার দেখা যাইবে—সাইদ অভ্যাস বশেই সেইদিকে তাকাইল।

কয় জোড়া বুটের শব্দে চমকিয়া সাইদ ঠিক পিছন দিকের জানালার বাহিরে রাস্তাটার পানে চাহিল। দেখিল—দু'জন ওয়ার্ডার একটা লোককে লইয়া চলিয়াছে। সাইদ চিনিল,—সে সেই কামার আসামীটা। পিঙ্গল দাড়িতে লোকটার মুখ ভরিয়া উঠিয়াছে, চুলগুলা ছোট করিয়া ছাঁটা। আর তাহার সে অস্থিরতা নাই, উন্মত্ততা নাই, নতমুখে নীরবেই পথ বহিয়া চলিয়াছে।

সাইদকে জানালায় দেখিয়া একজন ওয়ার্ডার জিজ্ঞাসা করিল,—কেয়া, ছুটি মিল হ্যায় ?

সাইদের মন ঠিক ওর পানে ছিল না, তবু সে ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—হ্যাঁ।

—ঘাবড়াও মাৎ ভাই, দুনিয়াকা এইসিই হাল ; তেরা নসীব।

সিপাহীর কণ্ঠস্বরে আসামীটা মুখ তুলিয়া চাহিল,—পিঙ্গল চোখের দৃষ্টি আর তেমন অস্থির নয়, কিন্তু কাতর চোখের প্রতি পাতাটিতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু জমিয়া রহিয়াছে, শ্লথ-গতি, সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া যেন একটা কাতর বিবশতা। সাইদ লোকটির পানেই চাহিয়া রহিল।

ঠিক ওই সময়টিতেই রায় আপনাদের ওয়ার্ডের বারান্দায় রেলিংএ ঠেস দিয়া আকাশ পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতির মধ্যে একটা সজল বিষণ্ণতা আছে, তাহারই প্রতিচ্ছবি কর্মহীন অবসরে মানুষকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ওই বিষণ্ণ আকাশের সজল ম্লানিমার মত, তখন যত অতীত বেদনার ইতিহাস, কবে কোন প্রিয়জন বুকটাকে রিক্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সব আসিয়া যেন মনের বুকে দর্শন দেয়।

বাপ মা কবে কোন কালে চলিয়া গিয়াছেন, অমর তাঁহাদের মুখ আর স্মরণ করিতে পারে না। আজ তাহার মনে পড়িল, একটি শুভ্র আয়ত অপরিম্লান দৃষ্টি, একটি নির্ভীক হাস্যোজ্জ্বল মুখ,—নিষ্ঠায়, পবিত্রতায় তাহার নিজেরই অতীত জীবনের প্রতিচ্ছবি।

তাহার সেই শুভ্র দীপ্ত চোখ আজ কেমন বিবর্ণ, পাংশু; যেন কে কালি মাড়িয়া দিয়াছে!

কে দিল?

এই বদ্ধ পাষাণ পুরী—

এই নরকের মধ্যে যে-প্রেতগুলা কর্দমাক্ত পল্বলের মধ্যে আনন্দ উচ্ছ্বাসে সরীসৃপের মত কিল বিল করিয়া বেড়াইতেছে—তাহারাই। তাহারাই তাহার সর্বাঙ্গ এমন করিয়া কর্দমলিপ্ত করিয়া দিয়াছে।

এ কর্দম যে ধুইলে উঠিবে না; অক্ষয় হইয়া বাকীটা জীবনের মত তাহার শুভ্র জীবনকে অপবিত্র করিয়া রাখিবে!

সহসা বুটের শব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল,—দুইজন প্রহরীর মধ্যে চলিয়াছে কালী। মানুষটির সর্বদেহ ব্যাপিয়া একটি শোকাচ্ছন্ন অবসন্নতা। সমস্ত জীবন যেন ক্ষয় হইতে হইতে আর তিলেকমাত্র অবশিষ্ট আছে—সেটুকু কোন্ মমতায় দেহ আঁকড়াইয়া রহিয়াছে কে জানে, কিন্তু ওটুকুও গেলেই যেন ভাল হইত। নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন অমর জিজ্ঞাসা করিল,—কাঁহা যায়েগা সিপাহীজী?

একজন সিপাহী ঘুরিয়া কহিল,—সেশন শুরু হুয়া বাবু, কোর্টমে লে যাতা হ্যায়।

অমর আবার নির্বোধের মত প্রশ্ন করিয়া বসিল,—কেয়া হোগা ইসকা।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সিপাহীটা কহিল,—কেয়া জানে বাবু, উস্‌কা নসিব!

—উস্‌কা ফাঁসি হোগা।

অমর পেছন ফিরিয়া দেখে চাটুজ্জে হি হি করিয়া হাসিতেছে।

ধমক দিয়া উঠিল সিপাহীটি—কেয়া বোলতা হ্যায় বাবু, তোমরা কলিজা কেয়া পাথরকে বনা হুয়া হ্যায়?

অমর লক্ষ্য করিল, আসামীটি কাঁদিতেছে; রব নাই, শুধু কয়ফোঁটা অশ্রু গাল বহিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ওই অশ্রুবিন্দুর মতই—ওর সব অস্তিত্ব অচিরেই হয়তো মাটির বুকে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। তথাপি এই ধরণীকেই লোকে কহে—মা! রাক্ষসী, ও রাক্ষসী; আপন সন্তানের রক্ত, মাংস, মেদে আপনার দেহ পুষ্ট করে।

আসামী লইয়া সিপাহীরা তখন চলিতে শুরু করিয়াছে।

চাটুজ্জে পিছন হইতে ঠেলা দিয়া কহিল,—এই শালা, এই, আয়—আয়, এদিকে আয়।

অমর কোন কথা কহিল না, সুদৃঢ় ধীরতার সহিত তাহার হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া আপনার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

চাটুজ্জে ডাকিয়া কহিল,—এই এই শোন—শোন না, এই দেখ—এইস্তা খুব সুরতি চিজ—

অমর ফিরিয়া দাঁড়াইল। কে যেন তাহাকে পিছন হইতে টানিয়া ফিরাইয়া দিল।

চাটুজ্জে অশ্লীল ভঙ্গীতে ইঙ্গিত করিয়া কহিল,—আজ একঠো

জেনানা আসামী কোর্ট যায়েগা, শালা খবর নিলাম—কি চিজ সে মাইরি, গোলাপ ফুলের রং, শালা চাউনি কি—যেন নেশা ধরে যায়।

অমর চাটুজ্জের পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়াছিল। কি বিশ্রী লোকটার ভঙ্গী আর কি এর চোখের দৃষ্টি! যেন আদিম কালের সেই সাপটা রক্তাভ ছোট ছোট গোল চোখের হিংস্র দৃষ্টি দিয়া অতি তীব্র আকর্ষণে আকর্ষণ করিতেছে, সমস্ত চেতনা যেন বিলুপ্ত হইয়া যায়!

অমর অভ্যাসবশে যন্ত্রচালিতের মত চাটুজ্জের দিকে কয়েক পা আগাইয়া গেল। চাটুজ্জে হিঃ হিঃ করিয়া হাসিতেছিল, সেই হাসিতে অকস্মাৎ তাহার মোহ টুটিয়া গেল। সে যেন আত্মরক্ষার চেষ্টায় সবেগে ঘুরিয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। অতীতের সেই নিষ্কলঙ্ক কিশোরটির পবিত্র মুখচ্ছবি তখনও বুঝি তাহার চোখের সম্মুখে জাগিয়াছিল!

অমরের এই অস্বাভাবিক আচরণে চাটুজ্জের মনটা যেন কেমন হইয়া গেল! সে কিছুক্ষণ রেলিংটায় ভর দিয়া রাস্তার পানে উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া রহিল; যত দূর দেখা যায়—কেহ কোথাও নাই—

সহসা পায়ের তলায় দৃষ্টি পড়িতে দেখিল, একটি পিপীলিকার সারি। বর্ষার আগমনে উচ্চ বাসস্থান অভিমুখে ডিম মুখে সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। তাহার সহসা কোন্ খেয়াল হইল কে জানে,—পা দিয়া বেশ ধীরভাবে একটির পর একটিকে দলিয়া দলিয়া মারিতে লাগিল।

অমরকে কাজ করিতে হয় জেলের অফিসে—কয়েদীদের টিকিটের ফাইল রাখার কাজ। বেশ লাগে তাহার কাজটি। মানুষের পাপের হিসাব, তাহার দণ্ড—এ যেন চিত্রগুপ্তের খতিয়ান!

এক এক সময় আবার সমস্ত চিত্ত তাহার ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে—মানুষের স্পর্ধা দেখিয়া—

মানুষের পাপের বিচার করে মানুষ !

কত বড় তাহার শক্তি ! এই শক্তি বলেই তো সে সমস্ত করিয়া যায়,—রাজা হইয়া বসে, ন্যায়ের বিধান করে, মানুষকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয় !

সুরেশের কথাগুলি তাহার মনে পড়িয়া গেল,—শক্তিমানের শক্তির অধিকারের চেয়ে বড় অধিকার আর নাই ! বিধাতা যে অধিকারে ধাতা—শক্তিমানও সেই অধিকারে দণ্ডদাতা—রাজা ! সিংহ যে অধিকারে পশুরাজ—মানুষও সেই অধিকারে মানুষের ভাগ্যবিধাতা—প্রভু !

সুরেশ আরও বলে,—জান অমরবাবু, মানুষ এই নগ্ন সত্যটাকে কত কথার ভূষণে সাজিয়েই না মহিমান্বিত করে তুলেছে ! কিন্তু সকলের চেয়ে হিন্দুরাই একে বেশী মহিমান্বিত করেছে—ওই 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' কথাটিতে। গোপন কিছু করেনি, কিন্তু এমন একটি মহিমা ওকে দিয়েছে যে, শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে নত না হয়ে উপায় নাই। ইংরাজীর might is right কথাটা নগ্ন—মহিমান্বিত নয়।

চেস্টা করিয়া অমর যত বার কাজে মন বসায়—বাহিরের একটি না একটি বৈচিত্র্য আজ তাহাকে মুক্ত পৃথিবীর বুকে টানিয়া লয়। বাহিরের দিকে একটা জাল দেওয়া জানালা—তাহারই মধ্য দিয়া বিস্তৃত মুক্ত ধরণী—

সম্মুখে একটা পাকা বড় রাস্তা দূর বহুদূর দেশ-দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে—পথিকের সারি চলিয়াছে কোলাহল করিয়া ; একটা গাছে বসিয়া কল-কণ্ঠ পাখি কল-কাকলিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। কয়টা ছোট পাখি উড়িয়া আসিয়া মাটিতে নামে আর কুটা কুড়াইয়া গাছে ছোট নীড়টিতে গিয়া বসে।

ও-ঘর হইতে জেলারের ডাক আসিল,—সাইদ আলির ফাইলটা আন তো হে,—চার হাজার পাঁচশো চল্লিশ নম্বর ফাইল।

অমর লইয়া গেল তিন হাজার পাঁচশো চল্লিশ নম্বর ফাইল।

জেলারবাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিলেন,—এ হল কি তোমার? ইডিয়ট কোথাকার!

অমর চকিতে আত্মস্থ হইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া ভুলটা সংশোধন করিয়া আনিল।

ভিতরের দিকের জানালাটা দিয়া চোখে পড়ে গরাদে-ঘেরা সারি সারি জানালা, যেন পশুশালার পিঞ্জর সব।

একটা জানালায় মুখ রাখিয়া সাইদ আলি তখনও দাঁড়াইয়াছিল।

অমর ভাবিতেছিল,—পশুর মত মানুষের হৃদয়াবেগ তত তরল নয়, তাই মানুষ পশুর চেয়ে উঁচু। পশু হইলে ওই অবস্থায় ওই জীবটি ওই লোহার গরাদের গায়ে মাথা কুটিয়া মরিত।

কিংবা হয়তো মানুষ পশুর চেয়ে কাপুরুষ, মরণের ভয়ে মুক্তির যুদ্ধে বীরের মত সে আগাইয়া যাইতে পারে না, পিঞ্জরের কোণে বসিয়া দীর্ঘ দিন-রজনী গোপনে কাঁদিয়া মরে।

বড় রাস্তাটা দিয়া পতাকা হস্তে একদল ছেলে গান গাহিতে গাহিতে কিসের শোভাযাত্রা লইয়া চলিয়াছে। অমরের সমস্ত ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় যেন একটা প্রবাহ বহিয়া গেল—

তাহারই সন্ধানে যেন ওরা গান গাহিয়া গাহিয়া পথে পথে ঘুরিয়া মরিতেছে। তাহাদের মধ্য হইতে সহসা একদিন সে হারাইয়া গিয়াছিল, তাহাকে খুঁজিতে এরা আজ পথে বাহির হইয়াছে—দিগ্‌দিগন্তরে ডাকিয়া ফিরিতেছে।

ফটকে সেই মুহূর্তে ঢং ঢং করিয়া প্রহর ঘোষণা করিয়া জানাইয়া দিল, বেলা নাই—বেলা নাই।

অমর দুই হাতে মাথাটা টিপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল—

এপাশে জানলা দিয়া দেখা যাইতেছিল,—একটা লোক হাতুড়ি হাতে ক্রমাগত ওই মোটা গরাদগুলায় ঠুকিয়া ঠুকিয়া চলিয়াছে আর

লৌহ পিঞ্জরের প্রতি অঙ্গটি বন্ধন-কঠিন কণ্ঠে যেন কহিতেছে,—'টুটি নাই—টুটি নাই—টুটিব না—'

বাহিরে শব্দ উঠিল মোটরের। জেলের ফটক খুলিয়া গেল, অমর বুঝিল বিচারাধীন আসামীর দল ফিরিয়াছে।

সহসা ও-বেলায় চাটুজ্জের সেই ইঙ্গিতটুকু মনে পড়ায় তাহার মন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। গোলাপ ফুলের মত বর্ণ-বিলাস, সুরা পানের মাদকতার মত বিভোল চাহনি তার,—সে ও ফিরিবে।

অমর সামনের জাল-দেওয়া জানালাটার পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

ফটকের চার্জ-ওয়ার্ডার গনিয়া গনিয়া খাতায় জমা করিয়া ছোট ফটকটা দিয়া কয়েদীর দল ভিতরে ঢুকাইয়া দিতেছে—

এ লোকটা চেনা—কটা চোখ, কটা চুল, মুখে চটুল হাসি,—এ সেই গুলিখোর ফুরু মিঞা।

ফুরু আপনা হইতে একটা সেলাম ঠুকিয়া কহিল,—সেলাম হুজুর, হো গিয়া। দো বরিষ নিশ্চিন্তি।

গেট-ওয়ার্ডার একটা ধমক দিয়া খাতায় তাহাকে জমা করিতে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই ফুরু পিছন হইতে জিভ কাটিয়া ভেংচাইয়া উঠিল। পিছনের কয়েদীগুলা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল...

অমরের কিন্তু হাসি আসিল না, তাহার সমস্ত চিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল সেই নারী-মূর্তিটি দেখিবার জন্য।

অভিসারগামীর মত আশায় আশঙ্কায় সে মুহুর্মুহু অস্থির হইয়া উঠিতেছিল।

আবার কয়টা পুরুষ কয়েদী চলিয়া গেল ;—কই আর তো কেউ আসে না!

এবার শোনা গেল কয়টা ভারী বুটের শব্দ, সিপাহীরা কি-যেন বহিয়া আনিতেছে।

অমর বেশ একটু সরিয়া গিয়া ভাল করিয়া আত্মগোপন করিল।

এ সেই খুনী আসামীটা! দুই জন সিপাহী ধরিয়া আনিতেছে। লোকটা ওই বাহকের টানে কোনরূপে পা ফেলিয়া চলিয়াছে,—যেন বলির পশু! অমর বিচলিত হইয়া উঠিল—

মৃত্যুর হিম-শীতল নিস্পন্দতা যেন ওর জীবনে একটা সুস্পষ্ট ছায়া ফেলিয়াছে! জীবনের এত বড় দৈন্য আর অমর দেখে নাই। ও যা করিয়াছে সে হয়তো মুহূর্তের ভুল; মুহূর্তের ভুলের জন্য এত বড় প্রায়শ্চিত্ত! অসহায় ভাবে অমর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

জেলারের গলা শোনা গেল,—এ বেটা তো জ্বালাতন করলে দেখি! যা হবার একটা হয়ে গেলে যে বাঁচি।

অপর একজন কে কহিল,—আদালতেও এমনি হুজুর, অসাড় হয়ে সমস্তক্ষণ শুধু জজ সাহেবের মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল, ওর উকিল কতবার কত কথা জিজ্ঞাসা করলে, তার হাঁ-ও নাই, না-ও নাই—যেন পক্ষাঘাত হয়েছে।

লোকটা কোর্টের কনস্টেবল।

সহসা কালী সকরুণ ভাবে কহিল,—আমার ফাঁসি হবে হুজুর—জজ সাহেব ক্ষণে ক্ষণে ভুরু কুঁচকে উঠেছিল—

গেট-ওয়ার্ডার খাতায় কয়েদী জমা করিতেছিল। সান্ত্বনা দিয়া কহিল,—দূর পাগল, দেখবি তুই খালাস পেয়ে যাবি—বেকসুর খালাস।

সান্ত্বনা অবশ্য দিল, কিন্তু কণ্ঠের সুর যেন কথার সঙ্গে সায় দিতে পারিল না—মেকী টাকার বাজনার মত তাতে মূল্যহীনতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সেটুকু বোধকরি ওই আশ্বাস-কাঙাল নিঃস্ব লোকটিরও অগোচর রহিল না, একটু ম্লান-হাসি হাসিয়া আপনার কপালে হাত ঠেকাইয়া কহিল,—দ্বীপান্তরও যদি দেয় হুজুর—

অমরের সমস্ত চিত্তটা যেন বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল—মানুষের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া।

সহসা কে জানে কেন তাহার মনে হইল মানুষ অমর নয়, ওই বিচারকও একদিন মৃত্যুর কুক্ষিগত হইবে ! ইহাতে যেন একটা দুর্বল সান্ত্বনা সে পাইল।

আবার পরমুহূর্তে এই অসংলগ্ন চিন্তার কথা ভাবিয়া সে মনে মনে নিজেই হাসিয়া ফেলিল।

আবার মোটরের শব্দ—

এবার একটি স্ত্রীলোক আসিয়া ভিতরের ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল। অমর ফিরিয়া তাকাইল কিন্তু সে দৃষ্টি তাহার অতি দুর্বল, মন হইতে লালসার সকল চিহ্ন যেন মুছিয়া গেছে। উদাস চিত্তে কুৎসিত চিন্তা মাথা তুলিতে পারিল না।

তবে হ্যাঁ, মেয়েটির রূপ আছে বটে !

জেলার জিজ্ঞাসা করিল,—কি হল ?

জেনানা ওয়ার্ডার কহিল,—সেসনে গেল। পুলিস যে এজাহার করলে জ্যান্ত ছেলের গলায় পা দিয়ে মেরেছে। দাইটিও কবুল খেলে যে, বললে—আমায় খালাস করতে ডেকেছিল, খালাস করে আমি দিলাম,—তারপর গলায় পা দিয়ে ছেলে ও আপনি মেরেছে।

জেলার আপন মনেই কহিল—মা হয়ে সন্তান হত্যা করে—

ফিমেল ওয়ার্ডারটি কহিল,—কলঙ্ক যে বড় খারাপ জিনিস বাবু ! সৎ জাতের মেয়ে—

মেয়েটি মুখ নত করিয়া রহিল।

খাওয়া দাওয়ার পর সুরেশ আসিয়া কহিল, কি রায়, ধ্যান করছ না-কি ?

অমর চকিত হইয়া কহিল,—ধ্যান ?

সুরেশ কহিল,—চাটুজ্জে বলছিল, তুমি ফটকে নিশ্চয় দেখেছ

—আজকের জেনানা-আসামী, কেমন হে? চাটুজ্জে তো ঠোঁট চাটছে।

অমর শুধু কহিল,—হুঁ।

—শুধু 'হুঁ'? বলই-না হে, তুমি তো কবিতা লিখতে—

সহসা অমর তাহাকে মধ্যপথে থামাইয়া দিয়া কহিল,—আচ্ছা সুরেশবাবু, দুর্ভিক্ষের মত অনাহারে মা যদি সন্তান হত্যা করে খায়, তবে তারও কি ফাঁসি হয়?

সুরেশ হাসিয়া কহিল,—অদ্ভুত মানুষ তুমি অমরবাবু, আর অদ্ভুত তোমার প্রশ্ন, কিন্তু কেন বল দেখি?

—এ মেয়েটি কি করেছে জান? সন্তান হত্যা। বিধবা হয়ে জারজ-সন্তান হত্যা—নিজে গলায় পা দিয়ে মেরেছে!

সুরেশ কহিল,—বিচারকের বিধানে কি আছে জানিনে অমরবাবু, তিনি বিধান মতে দণ্ড বিধান করবেন, তিনিও বিধানে বদ্ধ; আমি কি করতাম যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলি, আমি মেয়েটির ওই কৃত্রিম বৈধব্য ভেঙে দিয়ে ওর প্রণয়ীকে বিবাহ করতে বাধ্য করতাম। কিন্তু তুমি দুর্ভিক্ষপীড়িতা মা-এর সন্তান আহারের কথা কেন তুললে?

অমর কহিল,—আজ সমস্তটা দিন আমি 'অতীত-আমাকে' ফিরে পাবার জন্য সাধনা করেছি—তাই সুরেশবাবু, আজ কারও ওপর অবিচার আমি করতে পারিনি। প্রথমে যখন এই কথা শুনলাম, তখন মনে হল কি জান? মনে হল এর জন্য পৃথিবীর কঠোরতম দণ্ড একে দেওয়া উচিত। কিন্তু আমার 'অতীত-আমি' বললে—না, বিবেচনা করে দেখ, বঞ্চিত জীবনের কত বড় আকাঙ্ক্ষা ওকে পাগল করে তুলেছিল! বিধাতার দেওয়া রক্ত-মাংসের বুভুক্ষা ওকে সংযমের গণ্ডীতে বদ্ধ থাকতে দেয়নি। তারপর যা ঘটেছে, সে ঠিক লোহার-শেকলে টানা চাকা যখন দাঁতে দাঁতে পড়ে ঘুরে যায়, তখন তারই মধ্যে পড়ে-যাওয়া জিনিসের মত; ও মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বিবেচনা করতে

পায়নি, ওর মাতৃত্ব, ওর বিবেক, মনুষ্যত্ব সব পিষে গিয়েছে—তবু সেই চাকায় চাকায় ওকে ঘুরে আসতে হয়েছে।

সুরেশ কহিল,—আমি তো তাই বললাম রায়, নারীর অন্তরের যে বেগবতী পুরুষ-সঙ্গ কামনা, সেইটেই সংসারে পুরুষকে চিরদিন ধন্য করে, সেইটেই নারীকে পুরুষের একান্ত বিশ্বস্ত করে, আদর্শ পত্নী করে তোলে; তার কথা বিবেচনা করেই এ কথা আমি বললাম। ওই মেয়েটি যে-কোন পুরুষকে সেবায়, সৌন্দর্যে, প্রেমে অভিষিক্ত করে তুলতে পারত।

সহসা বুটের শব্দ শুনিয়া দু'জনেই চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল,—জেলার আর জন দুই ওয়ার্ডার।

একজন ওয়ার্ডার অমরকে দেখাইয়া কহিল,—এহি বাবু। এহি বাবু কো হাম হুঁয়া দেখা, আউর কোই নেই গিয়া।

অমরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

জেলার হাতের বেতটা দিয়া ওয়ার্ডারের হাতের কয়টা জিনিস দেখাইয়া কহিল,—তুমি সিগ্রিগেশান সেলের ওখানে গিয়েছিলে? এ সব তুমি দিয়েছ?

ওয়ার্ডারের হাতে এক টুকরা পাঁউরুটি আর একটা সিগারেট।

অমর ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—হাঁ।

জেলার কঠোর গম্ভীর কণ্ঠে কৈফিয়ত চাহিল,—Why? কেন, কেন দিলে তুমি?

হাতের বেতটা শূন্যে সজোর-আস্ফালনে যেন শিস দিয়া উঠিল।

তবু অমর কহিল,—বড় মায়া হল—

—মায়া! মায়া! এটা তীর্থক্ষেত্র, দয়া মায়া করবার স্থান,—নয়?

ঘা-কয় বেত অমরের পিঠে পড়িয়া গেল।

যাইবার সময় জেলার বলিয়া গেল,—এবার তোমায় কোন সাজা আমি দিলাম না, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান, বুঝেছ?

সুরেশ বিস্ময়ে বেদনায় স্তব্ধ নির্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনি দাঁড়াইয়াই রহিল। চাটুজ্জে আসিয়া কহিল,—কতবার না বলেছি তোকে, বিশ্বপ্রেম ছাড়—ছাড়, তা না, শালা কেবল—হুঁ ঃ—

সুরেশ এতক্ষণে কহিল,—এর চেয়ে তোমার ফাঁসি হলেই ভাল হত রায়, এ তোমায় এরা আছড়ে মেরে ফেললে!

চাটুজ্জে বাধা দিয়া কহিল,—কি যে বাবা তোমরা বল, আমি বুঝতেও পারি না ছাই! নেঃ, আয়,—একটু বেশী করে না খেলে রাত্রে ঘুমুতে পারবি নে।

অমর কহিল,—চল, সমুদ্রে পড়ে আর ব্যর্থ ভাসার চেষ্টা কেন —অতলের দিকে তলিয়ে যাওয়াই ভাল! এস সুরেশবাবু।

সুরেশও চাটুজ্জের চেলা হইয়াছে।

সেদিনও অন্ধকার রাত্রি, আকাশে মেঘ—কিন্তু বর্ষণ নাই, সেই জোনাকির খেলায় দীপালীর ফুলঝুরি,—গভীর রাত্রে দূরে মাদল বাজিতেছে। এদিক হইতে শোনা যায় কামারশালার সেই দীর্ঘ একঘেয়ে শব্দ—ঠ—ন্, ঠ—ন—

সমস্ত জেলখানাটা তন্দ্রাচ্ছন্ন; শুধু সেলের এক কোণে ঠেস দিয়া বিচারাধীন খুনী আসামী কালী আজও মৃদু গুঞ্জনে জীবনের জন্য বিলাপ করিয়া চলিয়াছে। সে বিলাপের ভাষা নাই, বিন্যাস নাই— গুন গুন করিয়া কান্না, কিন্তু অতি সকাতর, অতি সকরুণ!

আদিম ভাষাহীন মানব প্রথম শোকের আঘাত পাইয়া বোধ করি ঠিক এমনি করিয়াই কাঁদিয়াছিল।

বাঁচিবার কোন আশাই আর সে করিতে পারিতেছে না। ক্ষীণ আশা ও গভীর নিরাশার দ্বন্দ্বে ক্ষীণ আশা বারবার পরাজয় মানিয়া ওকে এমন শোকার্ত করিয়া তুলিয়াছে। মৃত্যুর এমন নিষ্ঠুরূপে আগমন সত্য-সত্যই মানুষের পক্ষে অসহনীয়।

ওর দৃষ্টির সম্মুখে সমস্ত ধরণী আজ অর্থহীন হইয়া উঠিয়াছে, সম্মুখের ভবিষ্যৎ একটি ভয়াল অন্ধকারের মধ্যে লুপ্ত হইয়া গেছে। সেই অন্ধকার পারাবারের কূলে গতিহীন হইয়া আজ আলো-রূপ-রস বর্ণ-গন্ধময়ী ধরণীর জন্য বিলাপ করা ছাড়া আর ও করিবে কি ?

জীবনকে সম্মুখের পথে টানে ভবিষ্যৎ, সেই ভবিষ্যৎ লুপ্ত হইয়া গেলে জীবন হইয়া ওঠে বোঝা। সে বোঝা লইয়া পথ-চলা মানুষের শক্তির অতীত। জীবন দেহের বোঝা বহিতে পারে, কিন্তু জীবন বোঝা হইয়া উঠিলে সে বোঝা বহিবে কে ?

কালী এক কোণে মাথাটা হেলাইয়া ঊর্ধ্বমুখে বসিয়াছিল,—নিমীলিত চোখ ! বাহিরের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের মত চোখের পাতার ভিতরেও একটি সুনিবিড় অন্ধকার স্তর—কল্পনার রেখাতেও বুঝি কোন ছবি সেখানে জাগিয়া ওঠে না,—বাসিনীর মুখ পর্যন্ত না, সমস্ত পৃথিবীই যেন একাকার হইয়া গেছে।

ছবির মধ্যে একখানি ছবি—একটা মানুষের মুখ মনের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে রক্তচক্ষু মেলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরবচ্ছিন্ন তাহার পানে চাহিয়া আছে,—সে বিচারকের মুখ।

মানুষটির প্রতি ভ্রূকুটি ওর মনের মধ্যে অক্ষয় হইয়া বসিয়া গেছে। গভীর শঙ্কা ও শ্রদ্ধার সহিত বার বার ওই ভ্রূকুটিগুলির অর্থ ও বিচার করিয়া দেখিতে চায়। ওই-লোকটিই যে আজ ওর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—ওর বিধাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিবারেই ওই ভ্রূকুটিগুলির অন্তরালে নির্মম দণ্ডলিপিই বেচারীর চোখের সম্মুখে জ্বলজ্বল করিয়া ওঠে ! তাই সে এমন করিয়া কাঁদে, জীবনের জন্য বিলাপ করিয়া যায়—চোখ হইতে ঝরে জল, তাও অবিরল ধারায় নয়, স্তিমিত গতিতে, ফোঁটায় ফোঁটায়। শঙ্কার আঘাতে ও যেন পঙ্গু হইয়া গেছে—

হাসপাতালের উঠানে জুঁই-এর ঝাড়গুলায় ফুলের সমারোহ পড়িয়াছে, বর্ষার বাতাসে জুঁই-এর সজল মৃদুগন্ধে চারিদিক সুরভিত,

—ওর ওই সেলখানির মধ্যেও সে গন্ধ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওর বুকের অন্তস্থল পর্যন্ত যাওয়া আসা করে।

ও কিন্তু সে মিস্টতা অনুভব করে না—মূর্ছাচ্ছন্নের মত শুধু বিলাপই করিয়া যায়।

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে বিলাপ হইয়া আসে মৃদু শিথিল। বাঁচিবার জন্য আজও ওর জীবন বিশ্রাম চায়, যে-কয়টা দিন বাঁচিতে পাইবে সেই কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকিতেও যে শক্তির প্রয়োজন!

আপনার অজ্ঞাতসারে ও কখন ঘুমাইয়া পড়ে, ঢলিয়া পড়ে—ধরণী মা হাত বাড়াইয়া যেন আপনার পাতা-কোলে টানিয়া লয়।

এ কোল ছাড়িয়া যাইতে মানুষের মন চায় না।

কয়দিন হইতেই সুরেশের সিগারেট কমিয়া যাইতেছিল। সেদিন পায়খানার ফেরত বারন্দায় উঠিতেই দেখে চাটুজ্জে তাহার বিছানা নাড়িয়া ঘাঁটিয়া উঠিয়া আসিতেছে, সুরেশের সহিত চোখোচোখি হইতেই চাটুজ্জে সপ্রতিভ ভাবে এক মুখ হাসিয়া কহিল,—খাবে নাকি, খাবে নাকি—আজ এক টুকরো বাড়তি হয়েছে।

—চাটুজ্জে তুমি চোর ?

—চাটুজ্জে প্রবল প্রতিবাদ করিয়া কহিল,—যা-তা বলো না বলছি, মাইবি ভাল হবে না,—হ্যাঁ। তুমি ব্যবহারে মানুষ চিনলে না—

সুরেশ গম্ভীর ভাবে কহিল,—খুব চিনেছি চাটুজ্জে, পা যেমন জুতো চেনে, তেমনি ভাবে তোমায় চিনে নিলুম। চোর তো তুমি বটেই—সে আমি ও, কিন্তু তুমি যে এত বড় চোর তা জানতাম না।

চাটুজ্জে নিঃসংকোচে হাসিয়া উঠিল। কহিল,—সুরেশবাবু বেশ মাইরি, বলে কিনা জুতো যেমন পা চেনে, না-কি—পা যেমন জুতো চেনে, বেশ-মাইরি—হাঃ হাঃ হাঃ—

চাটুজ্জে দিব্য হাসিতে হাসিতে আপনার ঘরে গিয়া উঠিল, আর সুরেশ তাহার গমন-পথের পানে চাহিয়া নির্বাক্ দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সময় অমর কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুরেশের ঘরেই চেয়ারখানার উপর বসিয়া পড়িল। সে যেন কেমন এক রকম—সকরুণ উদাসীনতায় স্তব্ধ, মূক !

সুরেশ সহসা যেন বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,—এই এক মানুষ—sentimental fool. আজ আবার কি হল তোমার ?

অমর সুরেশের কর্কশ উক্তিগুলা মনেই লইল না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—লোকটার আজ ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে।

—কার ?

—সেই কামারটার।

এবার সুরেশও যেন কেমন স্তব্ধ হইয়া গেল, কোন উত্তর দিতে পারিল না।

একটু পরে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অমর কহিল,—মানুষ কি ভগবানের আসনে বসতে পারে সুরেশবাবু ?

সুরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল,—আমি ভগবানকেই প্রশ্ন করি অমরবাবু—তারই প্রতিনিয়ত হত্যা করবার অধিকার আছে কি না ?

অমর চুপ করিয়া রহিল, এই নাস্তিকতার বিরুদ্ধে কোন তর্ক তুলিতে আজ আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

সুরেশই আবার কহিল,—আমার অনেক expectation রয়েছে, আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির আশা রয়েছে, মরতে আমি চাই না অমরবাবু ! কারও মৃত্যু দেখলে ভয় হয়—হয়তো আমিও জেলের মধ্যেই মরে যাব—জীবনটাকে ভোগ করতে পাব না।

অমর তবু কোন কথা কহিল না। সে ভাবিতেছিল ওই মানুষটির হতভাগ্যের কথা। যুদ্ধ করিয়া মানুষ মানুষকে মারে—মানুষ মরে, সে অন্যায় নিশ্চয়, কিন্তু তার মধ্যেও একটা সগৌরব সান্ত্বনা আছে। নির্ভীকতার সঙ্গে মৃত্যু বরণের গৌরব আছে, সান্ত্বনা সেও আপন শক্তি প্রয়োগ করিবার সুযোগ পায়।

ক্রোধের বশে মানুষ মানুষকে হত্যা করে—সে হয়তো মানুষের ভুল, তার মধ্যে গভীর আক্ষেপ আছে স্বীকার করিতে হয় কিন্তু এই-যে মানুষ মানুষের বিচার করিয়া প্রাণদণ্ডের বিধান দেয়—এর মধ্যে যে চরম দীনতা, তার চেয়ে দুর্ভাগ্য বোধ করি মানুষের আর কিছুই নাই। সমান অন্যায় করিয়া অপরের কৃত অন্যায়ের প্রতিকার···তার নাম ন্যায়—এ অমর স্বীকার করিতে পারিল না।

সুরেশ আবার কহিল,—আমার ওপর বিরক্ত হলে অমরবাবু ?

কিন্তু আমি আমার অন্তরের কথাই বলেছি. বিচার বিতর্ক করে কোন কথা বলিনি। সে বলতে হলে বলি কি জান? মানুষকে তুমি যতখানি দায়ী করছ, যতখানি অন্যায়ের বোঝা তার ঘাড়ে চাপাচ্ছ, ততখানি দোষ সে সত্যিই করেনি। রাষ্ট্রশক্তি, সুপ্রতিষ্ঠিত প্রবল শক্তি স্বভাবতঃই চেষ্টা করে আপনার অধিকার অবাধ রাখবার—কিন্তু তার বিপক্ষে মানুষের প্রতিবাদেরও অন্ত নাই। ওই প্রতিবাদ শুনে শুনে রাষ্ট্রশক্তি আপন অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে, মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দিচ্ছে; সে মহত্ত্বকে তার অস্বীকার করার উপায় নাই। হয়তো. হয়তো কেন—নিশ্চয় একদিন দেখবে, মানুষকে প্রাণদণ্ড দেবার অধিকার সে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু তোমার ভগবান অমরবাবু,—সে অতি নিষ্ঠুর হত্যালীলা প্রতিনিয়ত অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিবাদ মানুষ কি করতে পারে না, না মনে মনে করে না? নিশ্চয় করে, কিন্তু অসীম তার শক্তি. প্রতিবাদে কোন ফল হবে না জেনেই মুখ ফুটে সে বলে না,—এ অধিকার তার স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু যদি কোন দিন মানুষের সাধনা বিধাতার শক্তির পরিমাণ নিরূপণ করতে পারে, সেদিন জেনো সে প্রতিবাদ নিশ্চয় করবে, তার সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে।—একি—একি, তুমি কাঁদছ রায়?

সুরেশ তাহার হাত ধরিয়া টানিল।

অমরের চোখ দিয়া সত্য সত্যই জল পড়িতেছিল। সুরেশের এত কথার একটাও তাহার কানে যায় নাই, সে শুধু ওই লোকটির জীবনের দীনতার কথাই ভাবিতেছিল। সুরেশের আকর্ষণে অমর আপনার দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে হাতখানি টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে নিজের সেলটার দিকে চলিয়া গেল।

সুরেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল।

খাবারের ঘণ্টা পড়িতে সুরেশ আপনার থালা-বাটি লইয়া অমরের পাশেই গিয়া বসিল।

অমর একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া কহিল,—সেন্টিমেণ্ট আমার আর গেল না সুরেশবাবু, এইটেই আমার দুর্বলতা।

সুরেশ কহিল,—দুর্বলতা কি-না জানিনে রায়, কিন্তু মানুষের জীবনে এটা একটা দুর্ভাগ্য, তাতে সন্দেহ নাই।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া সুরেশ আবার কহিল,—ওর ফাঁসির চেয়ে তোমার হত্যায় বেশী দুঃখ হয় রায়, এমন পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকার চেয়ে তোমার ফাঁসি হলে ভাল হতো। একটু থামিয়া আবার কহিল, চুলোয় যাক, এস—দুটো বরং ফুর্তির কথা বলা যাক।

চাটুজ্জে ঠিক পাশেই বসিয়াছিল কিন্তু এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই—সুরেশের দিকে আড়ে আড়ে চাহিতেছিল। এবার সে অতি আগ্রহে প্রস্তাবটাকে সমর্থন করিয়া কহিল,—'যা বলেছ মাইরি সুরেশ, কি তোমরা God God কর বাবু, ও hang your God, God is nothing but botheration বলিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর সুরেশের গা টিপিয়া কহিল,—বউ-এর চিঠি দেখবে? এইস্যা চিঠি—

সুরেশ সহসা উগ্র হইয়া কহিল,—তোমাকে খুন করে ফেলব আমি!

খাওয়া দাওয়ার পর খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া সুরেশ ঘরে ফিরিতেছিল। ওদিকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে তালা বন্ধ করার শব্দে অন্ধকার যেন সচকিত হইয়া উঠিয়াছে! গাছের পাখিগুলা সন্ধ্যার কাকলি শেষ করিয়াও ওই শব্দে চকিত হইয়া মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিতেছে…

পিছনে শব্দ শুনিয়া সুরেশ মুখ ফিরাইয়া দেখিল···অমর।

সুরেশ অমরকেই খুঁজিতেছিল। এই তরুণটির প্রতি একটি মমতা কেমন যেন তাহাকে বিচলিত করিয়াছে।

—এই যে, কোথায় ছিলে রায়, বেড়াবার সময় তোমায় পেলাম না যে?

ম্লান মুখে অমর কহিল,—একটু সেলের দিকে গিয়েছিলাম—

সুরেশ তাহার মুখ পানে চাহিয়া কহিল,—লোকটা কি করছে?

অমর কহিল,—ঘুমুচ্ছে।

কয় পা চলিয়া অমর আপন মনেই কহিল, আজ যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে!

সুরেশ কহিল,—না. আমার বোধহয় কি জান? আমার বোধহয় ও মরে গেছে। একটু থামিয়া কি ভাবিয়া লইয়া সহসা আবার কহিল,—ভীরুর মৃত্যুর মত করুণ, ভীতিপ্রদ আর কিছুই নাই অমরবাবু! তাদের মৃত্যুভীতি সংক্রামক ব্যাধির মত মানুষকে বিচলিত করে তোলে। Cowards die many times before their death কথাটা মানুষের ইতিহাসে অতি-বড় লজ্জাকর সত্য। নরু স্বেচ্ছায় সগৌরব নির্ভীকতায় মৃত্যু বরণ করেছিল,—আজ মনে হয় সেদিন মৃত্যুভয়ে বিচলিত হইনি—বিচলিত হয়েছিলাম ওর তুলনায় নিজের দীনতা উপলব্ধি করে, আর আজ মৃত্যুকে মনে পড়ছে, প্রচণ্ড একটা ভয় যেন অস্থির করে তুলতে চাচ্ছে!

জেলের ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল একটি কালো মেয়ে,—নিকষের মত কালো বর্ণ কিন্তু তেমন কালোতেও একটি সুষমা আছে। বড় বড় চোখ, দীঘল পরিপুষ্ট দেহ, যেন পাথরে খোদাই একটি শ্রীমতী নারী মূর্তি। এই মেয়েটিই বাসিনী—ওই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কালী কামারের

প্রাণাস্পদা! প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত লোকটি কাহাকে শেষ-দেখা দেখিতে চায় জিজ্ঞাসা করিলে, সে এই সর্বনাশীর নামই করিয়াছিল।

সর্বনাশী বই-কি! ওই নারীটিকে লইয়াই তো বিবাদে কালীর এমন সর্বনাশ হইয়া গেল!

তা যাক, কালী কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তাহাকে দায়ী করে নাই।

এ নতুন নয়, জগতে নারীকে লইয়া পুরুষে পুরুষে, জাতিতে জাতিতে বহু ধ্বংস যজ্ঞ ঘটিয়া গিয়াছে, তবু কেহ কখনও নারীকে দায়ী করে নাই,—সর্বনাশী বলে নাই!

ছোট একটি ঘরের মধ্যে বাসিনীকে বসান হইল। শৃঙ্খল-জড়ানো লোহার গরাদে-ঘেরা বিশাল দরজা, রক্ত-বর্ণ প্রাচীরবেষ্টনী-বেষ্টিত পরিপার্শ্ব মেয়েটিকে যেন কেমন অভিভূত করিয়া তুলিল।

সমস্ত ঘর জুড়িয়া ম্লান অন্ধকার তন্দ্রাচ্ছন্নের মত এলাইয়া পড়িয়া আছে; বাহিরের আলোকের ভয়ে সে যেন বাছিয়া বাছিয়া এই প্রাচীর-ঘেরা বন্দিশালাটায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। দুনিয়া জুড়িয়াই তো এমন অন্ধকার কিন্তু এমন অনুভূতিটি তো সেখানে আসে না! বোধ করি বন্দিশালার নামের মধ্যে যে-বিভীষিকা লুকাইয়া আছে, সেই বিভীষিকাই এমন একটি ভয়াল অর্থ ঐ জড় উপাদানগুলিতে জড়াইয়া দিয়াছে।

বাসিনী সশঙ্ক অভিভূত দৃষ্টিতে ঘরখানির রুদ্ধ-চতুষ্পার্শ্ব, রুদ্ধ-ঊর্ধ্বের সর্বাঙ্গ দেখিয়া লইল। পিছনের পানে চাহিল, দেখিল বাহিরে গরাদেঘেরা ফটক,—রুদ্ধ-প্রতি-অঙ্গে তাহার নির্মম বন্ধন,—যেন নিষ্ঠুর ভঙ্গীতে নির্দয় হাসি হাসিতেছে! তাহার পা দুইটা ঠকঠক করিয়া কাঁপিয়া উঠিল!

ভিতরের ফটক খুলিয়া একটি পাংশু, শীর্ণ লোককে বাহির করিয়া আনিল। রুক্ষ, দীর্ঘ দাড়ি গোঁফে মুখখানা ভরিয়া গিয়াছে; যেটুকু দেখা যায় তাহাতেও যেন কে কালি মাড়িয়া দিয়াছে। নিষ্প্রভ

ঘোলাটে চোখ, তাহাতে দুটি পিঙ্গল তারা। তথাপি দেখিয়াই বাসিনী তাহাকে চিনিল—এ সে-ই!

দু'জনে মুখোমুখি যখন দাঁড়াইল তখনকার ছবি বোধ করি ছায়াচিত্রেও ফোটে না—ফুটিবার নয়! বাসিনীর ছল ছল চোখের করুণ ব্যথাতুর দৃষ্টি, কালীর মুখের সে বিমুগ্ধ অতি তৃপ্ত হাসি,—তাহার আকার হয়তো ছায়াচিত্রে ফুটিবে কিন্তু সে আবেগ—জীবনের স্পন্দন তো ফুটিবে না!

বাসিনী ছল ছল চোখে কালীর মুখ পানে চাহিয়াছিল,—ধীরে ধীরে দীর্ঘ রেখায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু চোখের কোণ হইতে চিবুক পর্যন্ত গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কালী অতি তৃপ্ত হাসি হাসিয়া বাসিনীর একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া ডাকিল,—বাসিনী!

একাগ্র দৃষ্টি তার ওই নারীটির মুখের ওপরে নিবদ্ধ, ওষ্ঠের বেড় ঘেরিয়া নীরব তৃপ্ত হাসি—সে যেন কৃতার্থ হইয়া গেছে।

ঘরের দেয়ালের গায় ঘড়িটা অবিশ্রান্ত টিক্ টিক্ করিয়া সময় গনিয়া চলিয়াছে। চির-বিচ্ছেদের মুখে দুটি প্রাণী শেষ-মিলনের আনন্দে নির্বাক্। দু'জনে যেন দু'জনের ছবি অন্তরে অন্তরে অক্ষয় করিয়া লইতেছে, কিংবা হয়তো শুধু শুধুই দু'জনে দু'জনের মুখপানে চাহিয়া আছে।

সহসা বাসিনী যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, রোদন রুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল,—ওগো কিছু বল তুমি!

কালী চকিতভাবে কহিল,—ভাল আছিস্ বাসিনী?

বাসিনী বিস্মিত নয়নে লোকটির পানে চাহিল,—এই কি বলিয়া যাওয়ার কথা!

কালী তেমনি পরিতৃপ্ত হাসি হাসিতেছিল। রব নাই, শুধু অধরের রেখায় রেখায় সে হাসির লেখা পূর্ণ-বিকশিত।

বাসিনী আবার কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা দরজার মাথায় দাঁড়াইয়া জেলার কহিল,—যাও, তুমি বাহিরে যাও, সময় হয়ে গেছে।

বাসিনী মুখ ফিরাইয়া জেলারের মুখপানে চাহিল, দুটি দীর্ঘ জলধারা তার চোখের কোণ হইতে চিবুক পর্যন্ত ছলছল করিতেছে!

জেলার কহিল,—এস!

বাসিনী নতমুখে চলিয়া আসিল। পিছনে তাহার জেলখানার গরাদেঘেরা ফটক সশব্দে রুদ্ধ হইয়া গেল। কিছু আর দেখা যায়

না—শোনা যায় শুধু পাষাণ পুরীর অভ্যন্তরের কর্মপ্রবাহের বিচিত্র শব্দ !

বাসিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া প্রাচীরের পাশের রাস্তাটা বহিয়া চলিতেছিল, সহসা তাহার মনে হইল কে যেন আর্তকণ্ঠে প্রাণ ফাটাইয়া ডাকিয়া উঠিল,—বাসিনী—

থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে কান পাতিয়া রহিল, কিন্তু কই আর তো শোনা যায় না ! হয়তো ভ্রম !

টলিতে টলিতে আবার সে চলিতে শুরু করিল,—কিন্তু অন্তর তাহার বার বার তারস্বরে কহিতেছিল,—না না, ভ্রম নয়, এ ভ্রম নয়, সত্য, সত্য, এ ডাক তাহারই—সে-ই নিয়ত তাহাকে এমনি করিয়া ডাকিতেছে। শুধু সে নয়—সকল বন্দীই বুঝি এমনি করিয়া নিয়ত প্রিয়জনকে ডাকিয়া ডাকিয়া মরে।

বাসিনী সশঙ্ক বিস্ময়ে সুদীর্ঘ সুউচ্চ পাষাণ-বেষ্টনীর পানে একবার তাকাইল—একবার তার গায়ে হাত বুলাইয়া দেখিল ;— কি কঠিন ! কি বিশাল ! কি ভয়াবহ !

আপন অজ্ঞাতসারেই তাহার কণ্ঠ হইতে সহসা একটা আর্তস্বর বাহির হইয়া আসিল,—বাবা গো !

প্রাচীরের গায়ে আছাড় খাইয়া প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল— বাবা গো !

ভিতরের ধ্বনিটিও তো তবে এমনি ভাবেই ফিরিয়া যায় !

সহসা সাইদ আলি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ঘুসঘুসে জ্বর, কাসি—দেহ শীর্ণ ! জেলার একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,— এমন শরীর কেন রে তোর ?

সাইদ সেলাম করিয়া কহিল,—কি জানি হুজুর ! অসুখ-বিসুখ তো কিছু নাই।

সাইদের আপাদমস্তকে দৃষ্টি বুলাইয়া জেলার কহিল,—হাসপাতালে যাবি, ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে আসবি ?

ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া কহিল,—ও কিছু নয়।

সাইদ একটু হাসিল।

দিনকয় পরে সকাল বেলায় গৌর, তহিদ, কেষ্ট জেলারের কাছে সেলাম জানাইয়া কহিল, সাইদের মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে হুজুর, ওকে আমাদের সঙ্গে রাখলে—

জেলার চমকিয়া কহিলেন,—রক্ত উঠছে ?

—হ্যাঁ হুজুর !

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব নিজে এবার সাইদকে দেখিলেন—সন্দেহ জনক একটা কিছু ঘটিয়াছে !

ওর অবস্থা লক্ষ্য করিবার জন্য ওকে সিগ্রেগেশন সেলে পাঠাইবার হুকুম হইল।

কালী গেল ফাঁসি ঘরে,—ফাঁসির আসামীর জন্য নির্দিস্ট সেলে। দরজার গরাদেগুলা পর্যন্ত জাল দিয়ে ঘেরা, ওপরের জানালার গরাদেও তাই, পাছে ফাঁসির আসামী গলায় দড়ি দিয়া কোন দিন ঝুলিয়া ফাঁসির দড়িকে এড়াইয়া যায়—তাই এই ব্যবস্থা।

জিনিসপত্র আর কি,—সম্বলের মধ্যে তো এক জোড়া কম্বল, একখানা থালা, একটা বাটি, দু'খানা গামছা, যাই হোক—তাই গুটাইয়া লইয়া যাইবার সময় সাইদ সকলের নিকট বিদায় লইয়া কহিল,—আসি ভাই সব, আবার কোন্ দিন থাইসিস ওয়ার্ডে ঠেলবে—

গৌর তাহার হাত দুইটা ধরিয়া কহিল,—দু'দিনেই সেরে যাবি দেখবি।

সাইদ হাসিয়া কহিল,—না, ঝাঁজরা বুক কি আর সারে—আর সারাও আমি চাই না। কি হবে সেরে ?

গৌর সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল,—পুত্রশোক বড় কঠিন, বড় খারাপ জিনিস—বুক একেবারে ঝাঁজরা করে দেয়। বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

সাইদ তেমনি হাসিয়াই কহিল,—পুত্রশোক কঠিন বটে কিন্তু তাতে বুক ছেদা করে না রে, এ করেছে কাচগুঁড়োয়। কাচ গুঁড়ো করে খেয়েছি আমি।

গৌর চমকিয়া উঠিল।

সাইদ কহিল,—বাঁচতে আর ইচ্ছে হয় না—খাটতেও পারি না আর। মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করেছি, কিন্তু রোজ রাত্রে ছেলেটা যেন সেই ঘাস কাটতে কাটতে বিষের জ্বালায় আমাকে ডাকে। তার চেয়ে—

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সাইদ অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

গৌর ব্যাকুল ভাবে কহিল,—ছি-ছি, এই কি করে রে? ছেলে-মেয়ে সব গিয়েও তো মানুষ সংসারী হয়!

সাইদ কহিল,—হয়, বাইরে থাকলে হয়তো হতামও, কিন্তু সে এখনও অনেক দেরি, আর এই খাটুনি—

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—নাঃ, এ বেশ হয়েছে! এই ভাল, যতদিন বাঁচি ভাল খেয়ে, বিশ্রাম করে বাঁচি; তার পর দেবে মুদ্দফরাসে টেনে ফেলে, দিক—

সিপাহী সাইদকে ডাক দিল—

সাইদ সিগ্রিগেশন সেলে গিয়া দেখে—বড় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবও সেখানে হাজির।

সাহেব বোধকরি তাহার ইতিহাস শুনিয়াছিলেন, কহিলেন,—মন খারাপ করো না তুমি, ভাল হয়ে যাবে অসুখ। আমি সরকারকে লিখছি তোমার খালাসের জন্যে। বাড়ি যাবে, শাদি হবে—আবার বাচ্চা লেড়কা হবে—

সাইদ যেন বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। সে সাহেবের মুখপানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। সাহেব চলিয়া গেলে জেলারের পায়ে ধরিয়া কহিল,—দোহাই হুজুর, আমায় যেন খালাস দেবেন না। বলিয়া সে হা হা করিয়া শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল।

দশ

মাসখানেক পর—

নিশাবসানের স্বচ্ছ অন্ধকারের মাঝেই জেলখানাটা যেন মুখর হইয়া উঠিয়াছে। অগণিত পদশব্দ শুধু,—কথাবার্তা বড় শোনা যায় না। এর অর্থ বন্দীদলের অজানা নয়। তারা বুঝিল—আজ আবার একজন যাইবে, ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দীপ নিভিয়া যাইবে—একটা জীবন-দীপ!

আপন জানালায় দাঁড়াইয়া অমর ডাকিল,—সুরেশবাবু!

মৃদু চাপা স্বরে সুরেশবাবু উত্তর দিল,—রায়, তুমিও জেগেছ?

—হ্যাঁ, আওয়াজ শুনছ ? মানুষেরই হাতে একটা মানুষের আয়ু শেষ হয়ে গেল বুঝি।

সুরেশ এ কথার কোন জবাব দিল না। উপরের জানালা দিয়া আকাশপানে চাহিয়া কহিল,—আকাশটা কি গাঢ় কালো আর কি নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতা ওর সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করে ; উঃ, ওর মাঝ দিয়েই কি বিগতআয়ু মানুষের জীবনের পথ রায় ?

রায় কহিল,—না সুরেশবাবু, ওর জোর করে বের-করা প্রাণ—মাটির বুকে বুকে লুটিয়ে লুটিয়ে কেঁদে বেড়াবে, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

সুরেশ কোন উত্তর দিল না, উপরের জানালা দিয়া আকাশের বুক জোড়া অন্ধকারের পানে তাকাইয়া রহিল। তার একাগ্র দৃষ্টির সম্মুখে ধীরে ধীরে অন্ধকারের রূপ ফুটিয়া উঠিতেছিল। অন্ধকারেরও একটা প্রভা আছে,—যে-প্রভার স্বচ্ছতায় সব কিছু দেখা যায় : কিন্তু মরণের সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া যে-অন্ধকার—সে-অন্ধকারের নিবিড়তা যে কল্পনাও করা চলে না। উঃ, কি ভয়াল বিভীষিকা সে ! সুরেশ শিহরিয়া উঠিল।

সহসা সমস্ত জেলখানাটার বুক চিরিয়া একটা অতি কাতর চিৎকারে কে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। সুরেশের মনে হইল সুদূর আকাশের ওই সুশান্ত স্তব্ধতাটুকু পর্যন্ত এই কাতর ধ্বনিতে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল,—প্রভাত আকাশের স্তিমিতপ্রায় তারা কয়টি পর্যন্ত বুঝি সে কম্পনে ম্লান হইয়া গেল।

শোনা গেল ও ঘর হইতে চাটুজ্জে ভয়ার্ত কণ্ঠে কহিতেছে,—তারা তারা ব্রহ্মময়ী ! শিবরাম শিবরাম ! রায়, ও রায়, শালা ভূত হবে নিশ্চয়।

আবার একটা চিৎকার—

সমস্ত পাখিগুলা সে চিৎকারে কলরব করিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণের জন্য এবার সমস্ত জেলখানাটা জুতার কঠিন শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল ; তারপর সব নিস্তব্ধ—একটা ভয়াবহ নিস্তব্ধতায় সমস্ত বন্দিশালাটা ভরিয়া গেল।

পরদিন। সে দিনটা ছুটি—

সমস্ত বন্দীর দল অকারণেই একটি সেলে স্তব্ধভাবে বসিয়া আছে ; একটা দুর্বহ বিষণ্ণতায় সকলেই নির্বাক্।

অমর, সুরেশ, চাটুজ্জে, এরাও আছে—কিন্তু স্তব্ধ, বিষণ্ণ, নির্বাক্ ! সহসা সুরেশ কহিল,—এ তো ভাল লাগে না। একটা কিছু কর,—যা হোক— anything ; আচ্ছা, সব খালাসের দিন হিসেব করি এস—

অমর কহিল,—না, সে আমার—শুধু আমার কেন সবারই পক্ষে একটা বিভীষিকা,—একটা dread ! কালই বোধহয় কেষ্ট বলে সেই ছোকরা বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে সে কোথা গেল জান ? বাড়ি গেল না, গেল কলকাতায় 'পিক-পকেটের' দলে। সেই ছোঁড়াটা ওকে ঠিকানা দিয়েছে। মুক্তি কল্পনার আগে আমায় এমনি একটা দলের সন্ধান দিতে পার সুরেশবাবু ?

চাটুজ্জে কহিল,—তার চেয়ে এস সকাল বেলায় এক 'দম' করে হয়ে যাক—

অমর কহিল,—The thing ঠিক ;—এইটেই চাইছিলাম যেন। আর সুরেশবাবু, তুমি আজ থেকে আমায় তালিম দাও insolvency act এ, যাতে বেরিয়ে একটা লাখো লাখো টাকার insolvency আমি নিতে পারি।

বলিয়া সে টেবিলে মাথা গুঁজিয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। চাটুজ্জে, সুরেশ দু'জনেই চমকিয়া উঠিল ; সুরেশ তার পিঠে মৃদু ঠেলা দিয়া কহিল,—কাঁদছ তুমি ?

মুখ তুলিয়া অমর হাসিটা দীর্ঘতর করিয়া কহিল,—না, হাসছি তো।

সেদিন রাত্রিটাও কেমন থমথম করিতেছিল। সবারই যেন চোখের ঘুম কে কাড়িয়া লইয়াছে,—সবাই যেন কান পাতিয়া আছে—সে কাঁদিবে—নিস্তব্ধ অন্ধকারে সে আসিয়া পাষাণ পুরীর মাটিতে মাথা কুটিয়া কুটিয়া কাঁদিবে—

কিন্তু কেউ কাঁদিল না—

সুপ্ত নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরিয়া শুধু ঝিল্লীর একটানা অবিশ্রান্ত চিৎকার—আর নিজেদের নিঃশ্বাসের মধ্যে বুকের পুঞ্জিত ব্যথা।